একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

বাহান্ন বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৪২৬

বৈশাখের দুপুরে বিশ্রামের সুরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচিত সহজ পাঠ গানে গানে

সহজ পাঠ
সহজ গান

সহজ পাঠ-এর আঠেরোটি কবিতা
সুরে সুরে গানে গানে ...

সুর ও পরিচালনা — মনন দাস

কণ্ঠ — বউল দাস

সহশিল্পীবৃন্দ :
দেবারতি ভট্টাচার্য, পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়,
সায়নীতা রায়, স্বাগতা মুখোপাধ্যায়,
মৌসুমি নাথ ও শিপ্রা দে।

শোনার জন্য এই লিঙ্কে ক্লিক করুন
www.archive.org/details/SahajPath

কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

বাহান্ন বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

১৪২৬

৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা- ৭০০০০৯
krishanupatrika@gmail.com

কৃশানু
বাহান্ন বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা ১৪২৬
সম্পাদক : মনন দাস

সূচিপত্র

প্রবন্ধ :

প্রচার ও জনসংযোগ
ডাঃ সমীর কুমার বেতাল

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
প্রদীপ মণ্ডল

স্কেচ - দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
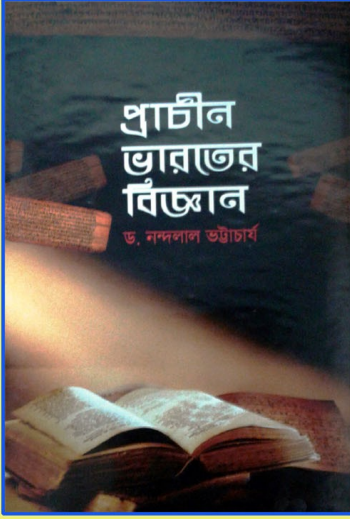
প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান

ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য্য

বেদকে বলা হয় বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ । বেদকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে ভারতীয় সনাতন ধর্ম ।বেদের প্রাচীনতম এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ঠ্যের জন্যই ইউনেসকো বেদকে সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত করেছে ।

বেদে আছে একদিকে দৈনন্দিন জীবনের নানা চাহিদা মেটাবার প্রার্থনা।রয়েছে পরবর্তীকালের দর্শনের বীজ ।বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয় অর্থাৎ বেদ হল ঐশী বানী ।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান :
বেদে আলোচিত বিজ্ঞানের সূত্রগুলি এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে ।

লিপিকা
৩০/ ১এ, কলেজ রো,
কোলকাতা ৭০০০০৯

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ! পৃথিবীর আদিকাল—প্রথম প্রাণীর জন্ম, তাদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ! কত প্রাণী পৃথিবীতে এলো, কত প্রাণী বিলুপ্ত হলো, যুদ্ধ চলছেই পরস্পরে। তারপর জন্ম নিল আদিম মানব, জন্ম থেকেই পরস্পর যুদ্ধ! গোষ্ঠীবদ্ধ হলো আদিম মানব—তখন গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যুদ্ধ! তারপর মানুষ কিছু সভ্য হলো, যুদ্ধ আরও বিস্তৃত। আরও উন্নত হলো মানুষ, শিখল অস্ত্র তৈরি করতে, তখন যুদ্ধ আরও প্রবল। মানুষ জ্ঞানী হলো, কথা বলতে শিখল, লিপি-লেখা, যুদ্ধ তখন আরও প্রবল, আরও বিচিত্র। পৃথিবীর যত মহাকাব্য সবেতেই যুদ্ধ! এরপর আরও সভ্য আরও জ্ঞানী হলো মানুষ, আরও বিচিত্র অস্ত্র তৈরি করে আরও বিশাল যুদ্ধ সারা পৃথিবী জুড়ে—বিশ্বযুদ্ধ...শান্তির কথা শুধু প্রলাপ বাক্য! একটু সংযত থাকা—এইমাত্র! আর কত সভ্য হলে যুদ্ধ ভুলবে মানুষ? কিছু মানুষ মেতেছে হত্যালীলায়। হত্যালীলা চালিয়ে তারা বুক ফুলিয়ে বিবৃতি দেয়। আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ ছাড়া পথ কোথায়?

আরও উন্নত সভ্যতা মানে আরও উন্নত অস্ত্র! এভাবেই পৃথিবীর আদিকাল থেকে সৃষ্ট হওয়া যুদ্ধ হয়ত পৃথিবীর অন্তিমে শেষ হবে।

তবু এরই পাশাপাশি মানুষের অন্য এক ধারা নান্দনিক চিন্তাধারায় নিজেদের বিকশিত করে.... সৃষ্টি করে কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা।

এরই পাশাপাশি মানুষের অন্য এক ধারা মানব কল্যাণে সৃষ্টি করে প্রাণদায়ী উপাদান। মরনোম্মুখ মানুষকে বাঁচিয়ে তোলে....

মানুষের সেই নান্দনিক চিন্তধারা বিকাশের পথে কৃশানু এক অণুমাত্র সাথী। নয় নয় করেও বাহান্ন বছরে পা দিল। হীরক জয়ন্তীর ষাট বছরে পা দিতে আর মাত্র আট বছর...

কৃশানুর প্রতিষ্ঠা থেকে আছি। সঙ্গী আরও এক প্রতিষ্ঠাতা অনেক আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন সে হরিপ্রসাদ ভৌমিক, তাঁকে প্রতি সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে স্মরণ করি। আরও অনেক সঙ্গী সাথী যাঁরা কৃশানুকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন এতটা পথ— যাঁদের একান্ত প্রচেষ্টা ছাড়া এতদূর আসা সম্ভব হতো না, তাঁদের অনেকেই আজ নেই, তাঁদেরও প্রতি পদক্ষেপে স্মরণ করি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে।

কৃশানু দীর্ঘজীবী হোক।

—মনন দাস

৫১বর্ষ অণুকবিতা অণু গল্পের প্রতিযোগিতার ফলাফল

১ম কবিতা ■ এইসময় ■ আশীষ ঘোষ

বিষণ্ণ আকাশ বিপন্ন বাতাস
নিরন্ন মাঠ অরণ্য লোপাট
তৃষিতা নদী তৃষাতুর পাখী
নিঃসঙ্গ সময় নিস্পৃহ জীবন

২য় কবিতা ■ হাত ■ আব্দুল্লাহ আল রিপন

কার হাত যেন ধরেছিলাম, ছুঁয়ে ছিলাম যেন কার মুখ।
হাতের ভেতর মুঠোভরে জন্ম নিল বিষবৃক্ষের শেকড়।
আলোবতী শিশির মুঠোর ভেতর হয়ে যায় আটপৌরে জল
মুখের ভেতর যা কিছু তুলি তিতা লাগে সব, বিস্বাদ বিষফল।

৩য় কবিতা ■ ব্রহ্ম পায়েস ■ অসীম দাস

পাখীর মতো গাইতে পারো গান
কিংবা মুগ্ধ নদীর কলতান?
পাততে পারো বক্ষে শীতল পাটি
ব্রহ্ম-পায়েস সুজাতা-হাত বাটি।

১ম গল্প ■ অন্তঃস্বত্ত্বা ■ শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

২য় গল্প ■ মাধ্যমিক পরীক্ষা ■ রথীন পার্থ মণ্ডল

৩য় গল্প ■ ধর্ম ■ দয়াল পাণ্ডা

লালন আর সে একঘরে রয় ■ ত্রিস্তান আনন্দ

(সম্প্রতি প্রয়াত বাংলা কবিতার স্বর্ণঈগল আল মাহমুদকে)

চাইনি খেতে মধু কভু
চেয়েছি শুধু মধু হতে
জেনেছি মধুর স্বাদ
মধুতে হয় না পেতে

মুঠোতে কুলোয় না মেঘ মরীচিকা
বায়ু মণ্ডলে ওড়ো ঘুড়ির লেজ হয়ে
সর্পের উড্ডয়নে রিক্ত লাটাই ভ্রমে
ছায়ার মৃত্তিকা স্মৃতি অস্পষ্ট ক্রমে
একান্নে স্বেচ্ছাচারী নগ্ন পাহাড়চূড়া
বুক বিঁধে ঝরে পড়ে বৃষ্টির হাতকড়া

অণু কবিতা ■ লীলাভস্ম

মধু ও কীট লীলোত্তীর্ণ হয় কাল ভ্রমরের পালা শেষ হলে

নিঃসঙ্গ দুপুরে ■ মনন দাস

নিঃসঙ্গ দুপুরে
টুপ করে ঢিল পড়ে বুকের পুকুরে
বৃত্তাকার তরঙ্গ ভেসে যায়
ছুঁয়ে যায় কানায় কানায়...
স্মৃতির আধার থেকে
উছলে ওঠে যত রূপালী মাছের দল
আধো ঘুমে তাহাদের নিঃশব্দ কোলাহল
নৃত্য ছন্দে বাজায় মাদল
পাঁজরের ধাপে ধাপে
বিভঙ্গ আলাপে....

অণুকবিতা ■ সমুদ্র অপার

কতদূরে যাবে তুমি শঙ্খচিল, সমুদ্র অপার।

পুজোর লগনসা প্রায় শেষ, তবু ■ শান্ত রায়

বিচিত্র গানের সঙ্গে শরীরে অশ্লীল মুদ্রা
এঁকে বেঁকে ওঠে...
বাক্‌দেবী কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছেন
খুব একা

আখ, শশা, ফুলকপি, ঢের বিক্রি হলো আজ
রসেবশে বেশিবেশি মাংস কেনে কেউ—
পুজোর লগনসা প্রায় শেষ, তবু
বেশকিছু দেবীমূর্তি
দাঁড়িয়ে রয়েছে মেন রোডে...

আর, বিশেষ দোকানে লাইন যথারীতি, সন্ধ্যের মুখেই!

অণুকবিতা ■ চুম্বন গভীর

চুম্বন আলিঙ্গন বিনা কারো সঙ্গে কি গভীর সম্পর্কে যাওয়া যায়?

মেয়াদ ■ অনুপকুমার আচার্য

শীতকাল চলে গেছে কতদিন
সর্বাণী!
একটু একটু বড় হচ্ছে দিন
রাত্তিরের এত তাড়া কিসের?
পৃথিবী কি আরও
বাসযোগ্য হয়ে উঠছে ক্রমশ?
প্রবাসের দিনগুলি
বিকেলের ছায়ার মতো...

অণুকবিতা ■ কথা

ইতিহাস কথা বলে ভূগোলের বেশে!

বসন্ত উৎসব ■ ধ্রুব বসু

মায়ার বন্ধন কাটিয়ে উঠেছে কবি
কিন্তু বাঁশির বন্ধন কাটাতে পারে নি আজও।
কবিসত্তার ওই হিরন্ময় গর্ভ
ওই অব্যক্ত অমৃতবিন্দু থেকে
উৎসরিত জ্যোতি একদিন
ভেনাস হয়ে উঠবে, বলবে,
“এসো পরমানন্দময়, এই বাঁশি দিয়ে
আমরা মধু বসন্তোৎসব করি!”

অণুকবিতা ■ আর্তি

উত্তরের বাতাস ওকে বোঝাও বিরহের কি যন্ত্রণা।

ভালবাসি ■ সর্বেশ্বর জানা

ভালবাসি মানুষের ভালবাসাবাসি
ভালবাসি রাত্তিরের জ্যোৎস্না রাশি রাশি
ভালবাসি নগরীর উৎসব ও কোলাহল
ভালবাসি পৃথিবীর নভঃ জলস্থল
ভালবাসি কাম্‌স্কাটকার ঝিল ও শীত
ভালবাসি প্রণয়ীদের হাস্যময় গীত,
ভালবাসি নৃত্যগীতের কমনীয়তা,
ভালবাসি প্রেম-পাখিদের গোপন কথা।

অণুকবিতা ■ শ্রম

শ্রমের ঘণীভূত রূপ মূলধন।

ফুটপাতের সংসার ■ মধুসূদন মাজী

দিগন্তজোড়া মাথার ছাদ
বাধাহীন গিনিপিগ সংসার!

ফুটো আকাশের ত্রিপল...
সরকারী বদান্যতার ফসল!

ছানাফাটা আলোয়...
আবছা সম্পর্ক!

বৈধতা-অবৈধতার সীমা বিলীন—
জন্ম হয় ফুটপাত দখলকারীর!
পায়ের তলার মাটির হাহাকার...
ফুটপাতের আকাশ অসীম!

রক্তাক্ত সময় ■ এস এম রাকিব

রক্তাক্ত সময়গুলোকে ঝকঝকে
কাচের গ্লাসে পান করেছি বহুবার।
চোখের সামনে ঝুলে থাকা
হিংস্র আয়নাটাকেও ছাড়িনি কখনো,
ফাটিয়ে চিৎকার করেছি, রুদ্ধকপাট
ফুসফুসটাকে তছনছ করেছি দু হাতে
তবুও, তবুও ভুলতে পারিনি
তোমার ঠোঁটের কার্ণিশ থেকে ঝরে পড়া
আমার টুকরো টুকরো অপমৃত্যুগুলো।

কষ্ট ■ শম্পা কাঁড়ার

নিকষ কালো কালো চাঙড় খনিতে কয়লার
'ও' যে পৃথিবী মন্থনে ওঠা হিরের বাহার
আদরে সোহাগে ভর করে ভরিয়েছি সাহসে
আনন্দের জলসায় সম্মানের আসনে বসিয়ে আবেশে।
ব্যর্থ জীবনের সাথে উষ্ণতার উড়ন্ত চুম্বন
কাছ থেকেও দূরে হারানোর মেল বন্ধন
অবশেষে নির্মল সত্য জীবন নয় মরণই
রূপ কথা ভেঙেচুরে হয় খানখান তখনই।
তার রঙিন চশমার কাচে পেলেন নতুন এক ছাঁচে
অবাধ্য অন্তর সব হারিয়ে কি করে বাঁচে।

আশ্চর্য এক ফিরে আসা ■ কৃষ্ণেন্দু দাসঠাকুর

এভাবেই প্রতিটি বুকের প্রান্তদেশে মাংসপিণ্ড ঝোলে
চোখের কোণে সরু নদীর মতো লেগে থাকে গোলাপের বাগান
উচ্চগ্রামে বেজে চলে সুগন্ধী রুমালের ইতিহাস
তবুও ধানবোনা খেতের হলুদ পাখির মতো বারবার ফিরে আসি
হয়তো দেখানোর তাগিদ থেকেই লাশের গায়ে ছড়িয়ে দিই বরফের নিস্তব্ধতা

নারীর সাধ ■ এস. কবীর

নারী চায় একটা সংসার
একটা বিছানা, একটা খাট
একটি সন্তানের পরিপাটি নিপাট
ছোট্ট হাঁড়ি, মাটির বাড়ি
উই এর ঢিবি, এক উনুন ছাই
একান্তই আপন স্বামীকে চায়
মাঘের রাতে একটি কম্বল
দীর্ঘ রাতের নিরন্তর সম্বল।

অণুকবিতা ■ তুমি

তুমি শীতের সকালে বৃষ্টির পরে এক আকাশ উজ্জ্বল রোদ

ঠিকানাটা স্পষ্ট হোক ■ চৈতালী রায়

অন্তহীন সিঁড়িকে আমি বাঁধতে চাই
ঠিকানাটা স্পষ্ট— প্রতিভাত হোক।
হোক তা খোলা দরজা অথবা বারান্দাহীন
তবুও গন্তব্য স্থলের ঠিকানা থাকুক সবুজ আলোয়।
লাল রক্তের মধ্যে চেতনারা খেলা করে
অস্তিত্বহীন বিপন্নতায় তারা ক্লান্ত হয়,
বেনিয়ম কাঁটার আঘাতে রক্তাক্ত হয়।
সিঁড়িগুলো উঠতেই থাকে—
আমি চাই সিঁড়িগুলো
তবুও ঠিকানাটা স্পষ্ট হোক।

সেই দিন ■ ধনঞ্জয় দত্ত

বিন্দু বিন্দু জলকণার প্রতিটি কণা মুক্তা হয়ে যায়
কখনো কখনো স্বমহিমায়।
কাক ডাকে ঘুমন্ত ভোরে যেদিন খুলে যায় অনুভবের চোখ
সেই দিন সকালটা অন্যরকম হয়।
পর্যাপ্ত আলো থাকা সত্ত্বেও রাস্তার প্রতিটি বাঁক
সাপলুডো খেলা খেলে একদিন,
একটার পর একটা বাস থামলেও
বাসস্টপ হয়ে পড়ে অচল সেইদিন ;
সবচেয়ে গতিহীন ট্রামগাড়িও ঘাতক হয়...
যে দিন কবির অন্তরে কবিতার জন্ম হয়।

অণু কবিতা ■ কথায়

কথায় কথা বাড়ে, নিস্তব্ধতায় বাড়ে রাস্তা।

ভালো মন্দ ■ শ্রীমন্ত দে

পান থেকে চুন খসলে কতই ঝড় উঠে যায় মনে
বাক্য ধারা ছুটতে থাকে এই জগতের কোণে।
যারা কেবল কর্ম করে ভুল তো তাদের হবে
অলস যারা তাদের বলো ভুল হয়েছে কবে।
ভালোর আলোর উজ্জ্বলতা ক্ষীণ হয়ে যায় ক্রমে
খারাপ ছোটে ঝড়ের বেগে ভালোর গতি কমে
দিন প্রতিদিন চলছে এমন গোলমেলে সব দেখে
অন্তরালে যমের সচিব হিসেব করে লেখে।

ফিরে দেখা ■ তপনকান্তি মুখার্জী

শিকড় থেকে শিখরে উঠতে যেতেই শিকড়হীন।
ব্যর্থতার রাগ, ক্ষোভ আর গ্লানি খচখচ করে
কাঁটাতারের বেড়ার মতো। স্বস্তিতে দাঁড়ানো
নেই একচুল। তবু এক চিলতে হিমেল হাওয়া
মাঝে মাঝে ওলটপালট করে দেয় মন। সামনে
ভাসে হেমন্তের ঘাসে ভোরের আলোয় না দেখা
শিশিরকণার কথা, গ্রীষ্মের দুপুরে না-শোনা
ডাহুকের ডাকের কথা। অতীতের দোহাই, এ
পাপক্ষরণ নয়, এ হলো পাপক্ষলন।

অণু কবিতা ■ আত্মমগ্ন

একটা জিজ্ঞাসা চিহ্নে জাগে নারীর অনন্তবাসনা।

আমার জীবন ■ বুদ্ধদেব ঘোষ

এখন আমার দু-চোখে
জলখরিস খেলা করে
ঘুমে অঘুমে।
সময়...
আমি ভালো আছি
ভালোই আছি তোমার
বিষ চুমে।

অণু কবিতা ■ এখনও

এখনও বাতাসে গন্ধ পাই হিটলার তোমার।

আদল ■ আত্রেয়ী চক্রবর্তী

মনের কাচে বৃষ্টির জল
ঝাপসা চারিদিক
রোদ উঠলে বিন্দু উধাও
আদলটাই চারিত্রিক।

বৃষ্টি ঝরার গল্প ■ অসিত দলপতি

ধর্মান্ধতার আগুনে পুড়ছে দেশ।
বাতাসে বৈরী হাওয়া
মেঘ জানে বৃষ্টি ঝরায় গল্প।
মানবতা বিপন্ন হলে শোক বাড়ে হৃদয়ের অলিন্দে।

শৈশব ■ শুভম রায়

তখন ছিলাম আমি
নতুন শৈশবের ছোট্ট শিশু।
বুঝতে না তখন আমার
যতসব অব্যক্ত কথা।
বুঝছ এখন মূল্য কি তার?
বুঝে হবে এখন কি আর।
সময়টা যে পেরিয়ে গেছে,
জীবনটা যে বদলে গেছে।
শৈশবের সেই ছোট্ট শিশু,
আজ যে বড় হয়ে গেছে।

তল থেকে বহুতল যেন ■ চৌধুরী নাজির হোসেন

আলো থেকে আলোহীন পথ
ছায়া থেকে গূঢ় ছায়ার ভিতর
চলে যায়। এও এক চলাচল
চরাচর জুড়ে অন্ধকার জ্বলে ওঠে
আহা নগর সভ্যতা।
এই কি চাওয়া আমার?
এলইডি বাল্বের নীচে ওভার ব্রীজের
মতো সরীসৃপ পারাপার
সেই আলো আর আলোহীন আদিমতা তল থেকে বহুতল যেন।

অণু কবিতা ■ বুঝতে পারি

গাছের পাতা নড়লে বুঝতে পারি এখনও বেঁচে আছি।

মরসুমী ■ তাপসী লাহা

তাবৎ অস্থাবর অনুভূতিগুলো চষে ফেলি,
অরন্ধন চলে যায় বেলা প্রতীক্ষায়
জানা নেই কার তরে।
কার প্রতীক্ষায় মৌনগুনি প্রহর
এ জীবন অবিরাম ঘূর্ণিপাক অস্তাচলে।
কার সম্মোহনে এ বিবশ কথা, বাঁশি, সুর
কোন এক নদী কোন এক চরে....
অমানিশা সাক্ষী রুপল জল কুলকুল
মনতলে।

শিল্পীর চোখ ■ অসীম মালিক

বিশ্বাসের বিসর্জন হয়,
হয়তো আবাহনের জন্যই।

বিশ্বাসের কাঠামো থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরে যায়
সন্তান স্নেহে লালিত মাটি। ধুয়ে যায় পছন্দের রং...

পুনরায় আবাহনের জন্যই
শিল্পীর হাতে অক্ষত থেকে যায় রং তুলি।

প্রতিমার বিসর্জন হয়;
বিসর্জন হয়না শিল্পীর চোখ।

অণু কবিতা ■ শিকার

টিকটিকি জানে, আলোর শিকার আলোকপ্রেমী মুখ।

সূর্যাস্ত ■ অতীশচন্দ্র ভাওয়াল

মধ্যাহ্ন গড়িয়ে যাচ্ছে
অপরাহ্নের দিকে
আমার চাই না এই অপরাহ্ন।
মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে আমি
উপভোগ করতে চাই সমগ্র জীবন তটিনীকে।
আমৃত্যু হেঁটে বেড়াতে চাই
গনগনে মধ্যাহ্নের উঠোনে।
অলস, অবসন্ন অপরাহ্ন আমার চাই না
মধ্যাহ্নের উঠোনে দাঁড়িয়ে আমি
হোক আমার সূর্যাস্ত।

অণু কবিতা ■ স্রষ্টা

অমর সৃষ্টির মাঝে কাঁদে স্রষ্টা।

অণু কবিতা ■ রাফিউল আলম

তোর ভাবনাগুলো আজ আমার হৃদয়ের রক্ত মাখে...

অণু কবিতা ■ স্মৃতিরঞ্জন পানিগ্রাহি

দেহের বয়স বাড়ে; মনতো জওয়ান; আমি তাই চিরকাল হতে চাই মন...

সেই ডাকের অপেক্ষায় ■ স্বপ্ননীল

যদি ডাকো এখনই চলে যেতে পারি তোমার কাছে
কিন্তু যাবো না। যেতে হলেও অনেক শর্ত লাগে তাই যাবো না।
যাবো না আমি কোন শর্ত রেখে
শর্ত রাখলে আবার ফিরে আসতে হয়
আমি চাই তোমার কাছে পাকাপাকিভাবে চলে যেতে
ফিরে আসতে বড়ো ব্যথা। এই দ্যাখো ফিরে আসার কথা শুনে
কী ভীষণ মন খারাপ। অথচ যাওয়ার কথা শুনলে
পা যেন বাড়িয়েই আছি আগে থেকে।
একবার ডেকে দেখো...
এখনই চলো যেতে পারি একেবারের মতো তোমার কাছে।

অণু কবিতা ■ ২১শে ফেব্রুয়ারি

বেদ শুনতে শুনতে লিখে ফেলেছিলাম ২১শে ফেব্রুয়ারি

প্রতীক্ষা ■ কাকলি চট্টোপাধ্যায়

এমনও একদিন আসবে...
তুমি আমার সামনে বসবে খোলা খাতার মতো
মনের সব দরজা-জানলা খুলে দিয়ে
আমরা সেদিন তোমার ফুল হয়ে ফুটে থাকা ভুল ছুঁয়ে যাবো
হয়তো কাঁটা বিঁধে রক্তস্নাত হবে।
হয়তো বা কিছু ফুল বিষফল হয়ে আজীবন নীল রঙে রাঙাবে ক্ষত
আমি তাকে নরম পালকের স্পর্শ আর জড়িবুটি দিয়ে ঢেকে দিয়ে বলবো
দেখেছো! আগে যদি ছুঁতে দিতে,
আমি বসে থাকি সেই 'হয়তো' প্রজাপতির প্রতীক্ষায়।

কবিতা জন্ম ■ আশিস ভৌমিক

প্রথম কবিতায় থাক শব্দ হীন কিছু কথা
মুগ্ধ নয়নে শুধু চেয়ে থাকা।
দ্বিতীয় কবিতায় আমি আদিম নির্জনতা
ভাষা হীন শব্দ কিছু ভাঙবে নীরবতা।
তৃতীয় কবিতা হোক সুতীব্র চিৎকার
খানখান ভেঙে যাওয়া না পাওয়া অঙ্গীকার

বাকি সব কবিতায় আমি ফোটাব ফুল
নিজস্ব অনুভূতি।
বাক্যের বিন্যাসে গাঁথা সে
প্রেম বা প্রকৃতি।

অণু কবিতা ■ মনে রাখে?

কত তারাই ঝরে যায় শীতের কুয়াশা মেখে আকাশ কী মনে রাখে?

জীবনমুখি ■ পশুপতি ভদ্র

টলমল জলের আঁধারে স্বপ্নের খিলান
শালুক পাতার গালে ব্যক্তিগত টোল।

স্পর্শ অনুভবে জীবনমুখি আনন্দের গান
বৈকালের গোধূলি আলোয় ধরেছিলে হাত।

আমরা যারা গ্রামে ফসলের উন্মুক্ত আগুন
একদিন আমার অন্দরমহলে তোমার জন্ম।

দেখো সামনের শীতে আমাদের ঈশ্বর
চিনতে পারি তোমার অনুভবে ঘাস ফড়িং।

স্পর্শ অভিজ্ঞতায় জীবন যুদ্ধের মহাকরণ
ভালোবাসার অন্দরমহলে আনন্দের জন্ম।

বয়সের সাথে ■ বিমল মণ্ডল

জন্মাবার পর মায়ের কপালে অসুখীর ভাঁজ
শৈশব ও কৈশোরের নিদারুণ সুখ ও দুঃখের অনুভূতি
পৃথিবীর 'মা' অভিধানে দিন ও রাতের ব্যবধানও বাড়ে বয়সের সাথে
সন্তানের জন্মদিন কিংবা বিবাহ বার্ষিকীর সাথে
এগিয়ে যায় মায়ের পড়ন্ত বিকেল
বিষণ্ণতার ছায়া অঞ্চলে জ্যোৎস্না মোড়া অজানা বয়স
নিয়তির অমোঘ বিধানে চিৎ হয়ে শুয়ে মা গ্রাম্য পথের পরে
আমি কিছুটা সময় ধরে আকাশের দিকে চেয়ে
চোখের কোণে ছড়িয়ে পড়ে জল
এ ভাবে বয়সের সাথে সাথেই কোনো দিন চলে যাবো মায়ের কাছে।

অণু কবিতা ■ পথরেখা

সরু পথরেখা ধরে জীবন হাঁটছে নিজের গতিতে।

অণু কবিতা ■ গাঁয়ের বধূ ■ সুশীল কুমার রায়

শঙ্খ বাজিয়ে তুলসী তলায়, গাঁয়ের বঁধূ ঘোমটা মাথায়

দর্পণ ■ বিধান শীল

একটা নিজস্ব ফ্রেমের ভেতর বাঁধা থাকে সুখ

নিয়তি, অহরহ পরীক্ষা করে জ্বলন্ত অগ্নিবলয়
সময়, এইভাবে ঝাঁটা মেরে খেয়ো না উৎসব

আশঙ্কার কলসে মেপে নিচ্ছে ক্ষত
প্রিয় মাঠ করো না চিতার শ্মশান
বেদনা মিশ্রিত আঘাত ঠোক্কর মারে যাপনের দেয়ালে।

বিদায় কোল জুড়ে কেন আনো দুর্বোধ্য অসুখ?

মনের আগুন ■ সন্দীপ রায়

ভিতরে আগুনের লেলিহান শিখা
বাইরে উত্তাল বাতাসের ঢেউ
এক সময় আগুন জ্বলল দাউ দাউ
গ্রাস করে নিলো গোটা বনাঞ্চল।

আগুন কখনও ক্ষমা করে না
গোপনে ভালোবাসতে শেখায়
পুড়িয়ে মারে গভীর যন্ত্রণা
বিশুদ্ধ অলংকারের শিল্প সুষমায়

পুড়ে যাক জ্বলন্ত ফানুস
একটু আগেও ভেসে যাচ্ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণ।

দুঃখের খরিদ্দার ■ মৌপর্ণা

ইচ্ছে করেই... দুঃখ কিনি আমি।
আনন্দের পরেই যে বিষাদ লাইনে—
তা আমি জানি, আমি জানি।
তবুও আমি শখ করেই ....দুঃখ কিনি!
ভয় হয়! ভয়!...যদি আমি ভুলে যাই...
কীভাবে আনন্দ ছাড়া বাঁচতে হয়!
তাই অভ্যাসে রাখি,
আনন্দেই চোখে দুঃখ আঁকি!
জেনে শুনেই... দুঃখ কিনি আমি...
সুখ বেচে বিষাদ কিনি আমি।

স্বয়ংক্রিয় ■ গৌতম কুমার গুপ্ত

লুণ্ঠন নেই আমার
যথাযথ অস্ত্রাগার
যত্নচর্চিত কাঠামোর পেরেকে আমার ঝুলি
লগ্ন পাঁজিপুথি সঞ্চয়িতা পুরাণ ভাণ্ডার

নিজেকেই অবাক করি
নেড়েচেড়ে দেখি তীক্ষ্ণতা, বিষ
নিক্ষেপের আগে

নিজেকেই লুণ্ঠন করি প্রথাগত
সবিশেষ ছিঁড়িখুঁড়ি স্নায়ুতন্ত্র

ঈশ্বর মনে হয় স্বয়ম্ভূ প্রতিরূপ।

চন্দ্রিকা ■ সৌমেন ধাড়া

সবাই সাজাহান হতে চায়,
না হোক গড়া প্রেমের তাজমহল,
সবাই প্রিয়সখী হতে চায়
না হোক শত জনমেও প্রিয়মিলন,
সবাই নূপুর হতে চায়।
তরুণীর কোমল নরম পায়,
না হোক রুনুঝুনু তার কথকতা,
কানুর বাঁশি তারই পানে ধায়।
সবাই আনন্দ পেতে চায়
না পেয়েও প্রেম —একচিলতে সিঁদুর,
তবু থাক অট্টালিকার উষ্ণ আহ্বান।
হাতে হাত রেখে চলে সীমাহীন বহুদূর...

বাবু ■ সূর্যস্বপন ঘোষ

নুন আনতে পান্তা ফুরোয় মজুরের দল কাটছে মাটি
মসনদ হবে, বাবুদের বিলাসী মকান।
ভূত নেই ভবিষ্যত নেই খুঁড়েই চলে মাটি

এইসব হাসিমুখ মজুরের দল,
আমার গাড়ি, বাড়ি, আসবাবপত্র, সুখের সাজানো বাগান
সবই তো ওরাই গড়ে দিলো।
ওদের ঘাম রক্ত ক্ষুধা লেগে আছে আমাদের মসনদের গায়ে।
আমাদের সুখের ঘরে কত দুঃখ জমা রেখে গেলো,
হাসিমুখ মজুরের দল আমাদের বাবু বানালো।

অণু কবিতা ■ এপার ওপার

কাব্য মালার ঝংকারে মন মেতেছে দুই পাড়ে।

আবহাওয়া ■ রাম সরেন

কখনো মেঘের ভীড়ে
ভরদুপুরে সূর্য হারায়
অন্ধকারেও নীল আকাশে
গল্প করে চাঁদ তারার।

সকালে কুয়াশা কেন
হালকা বাতাস ভারী করে,
বিকেলে মেঘ কেন ওই
গর্জে ওঠে উচ্চস্বরে।

অণু কবিতা ■ শেষ দিন

মন যেদিন তোমায় ভুলে যাবে সেদিন আমার শেষ দিন হবে।

ঋতুদের কার্যালয় ■ ফটিক চৌধুরী

নিছক ছকে বাঁধা জীবনে ক্লান্তি আসে
তাই ঘুম থেকে উঠে সূর্যের মতো পূর্ব
থেকে পশ্চিমে খুঁজে বেড়াই কোথায় রয়েছে
দিনযাপনের পাণ্ডুলিপি, যেখানে কবিতা
ছায়া ফেলে ক্লান্তি নয়, শান্তি দেয়।

নতুন বছর নিয়ে এসো হে বৈশাখ
শুরু করো তোমার বৈচিত্রের যাপনচিত্র
প্রতিটি ঋতু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ততা খোঁজে
কেউ পায় করতালি কেউ খায় কিছু গালি।
ঋতুগুলি থিতু হয়ে বসে থাকে নিজ কার্যালয়ে।

অণু কবিতা ■ সময়

সময় শুধু ক্ষয় হবার জন্য তবু সেই শেষ কথা বলে।

শিশু ■ বিবেকানন্দ দাস

শিশু যখন যেখানে থাকে
তখন যে জলধি
অঙ্গ বিচ্ছুরিত আলো
জ্বলে নিরবধি।

অন্তরায় ■ দেবাশিস হালদার

তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি—এ তো অহংকার নয়
নিখাদ প্রতিবন্ধকতা
ক্ষয়িষ্ণু পাঁজর বোঝেনা হৃদয়ের কথা।
জ্বলে ওঠে ব্যর্থতার আগুন লুকাতে লুকাতে
পুড়ে গেছে ভিতরের ঘর
কোথায় রাখবো তোমাকে?
কীভাবে সামলাবো এই প্রশান্ত নিবিড়তা?
আগ্রাসী আঁধারে ডুবে যাবে
তোমার স্নেহার্দ্র জ্যোৎস্না।
পাথরে বীজধান ছড়ালে নষ্ট হয় শস্য-জীবন।

অণু কবিতা ■ এক লাইনের কবিতা

তোমাকে ভুলতে গিয়ে গভীরে যাই জড়িয়ে।

যন্ত্রণার দাবানল ■ নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি এখন যন্ত্রণার দাবানল জ্বালিয়ে চলছি
সরিষা দানার মতো যন্ত্রণাগুলো
ভেদ করে মনের মন্দির
যেখানে হাহুতাস অহরহ
ক্রন্দনের বাদ্য বাজার প্রাণসায়রে
যবনিকা টানবে কখন যাদুকর
জগতটা ধ্বংস হবেই যখন
কেন আর বৃথা মান ভাঙাবো
কখন তুমি বাঁশি বাজাবে
ভোর না হতেই কু-আশায় মন পাগলপারা।

অণু কবিতা ■

জ্যোৎস্না রাতেরা এখন বায়না নিও না।

মনের ব্যবধান ■ মুকুল ভৌমিক

দূরত্ব কমছে নাকি, পৃথিবী আর সূর্যে
তবে ভাঙছে যে বাঁধ প্রেমেদের ধৈর্য্যে?
যতটুকু জানি, প্রেম, মানে নয় শারীরিক—
মেলবন্ধনে পাওয়া সুখ তাপ আংশিক
শত আলোকবর্ষ দূর হতে যদি দুটি মন,
এক হয়, ঈশারায় হয়ে যায় তাদের কথন,
স্বপ্ন ও বাস্তবে যদি বাঁচতে জানে সুখ বাসা
তবে তো পূর্ণতা পায়, বলো ভালোবাসা।
পৃথিবী আসছে সূর্যের কাছে, নেই সংবিধান
আসলে শরীরের নয়, কমাও মনের ব্যবধান।

অণু কবিতা ■ সুখটুকু নিয়ে

সুখ টুকু নিয়ে অবশেষে প্রিয়, শেষ চিঠি লিখে দিও।

সবুজের ভালোবাসা ■ সমিত কুমার হালদার

বাদামী বাকলে সবুজের ভবিষ্যৎ
অপ্রত্যাশিত আলিঙ্গন...
আবার জেগে উঠছে প্রেম।
বুক জুড়ে অথই বিষণ্ণতা,
হাসিতে মিলিয়ে যাক আঘাতের চিহ্ন
সবুজ হয়ে উঠুক আরো সবুজ।

অণু কবিতা ■ উপহার

মাঝদরিয়ায়, উপহারে দিলে 'চোখের আড়াল'।

অতঃপর ■ ঋজুলেখা দত্ত

থমকে যায়নি সময়
কেউ মোমবাতি জ্বালায়নি
কেউ উপোস যায়নি একবেলাও
যে ফুলগুলো ফুটবে বলেছিল কথা রেখেছে সবাই
ভালোবাসার শব বুকে জড়িয়ে কেউ একবারো বলেনি 'থেকে যাও'

ইচ্ছে ■ বনানী চক্রবর্তী

তাঁর জীবনের সকল ইচ্ছা পূরণ হোক এটাই আমার ইচ্ছে।

সৎকার ■ গৌতম হালদার

প্রথম যেদিন তোমার আমার হল সাক্ষাতকার, হয়েছিল আমার সবুজ স্বপ্নের সৎকার

বদল ■ দেবপ্রতীম পট্টনায়ক

তারুণ্যে আগ্রাসন বিপথে চালিয়ে আত্ম অহংকারে অজান্তেই অনেকটা পথ হেঁটেছিলাম, আকাশ ছোঁয়া দম্ভ তখন বিবেক কে অবহেলা করতে শিখিয়েছিলো।

সুখে ছিলাম তবে সবসময় সুখের খোঁজে থাকতাম, উদ্বেলিত থাকতাম, ক্ষণিকের বিষাদও অবসাদ নামিয়ে আনতো বুকে; দ্বন্দ্বে থাকতাম আপন পরের।

চেতনা, পুথির শিক্ষায় আসেনা আমারও আসেনি। যে ভুল পথে আমি হেঁটেছিলাম সেই ভুল পথ আমায় শিক্ষা দিয়েছিলো; তাগিদ দিয়েছিলো আত্ম উপলব্ধির।

পথ আমি এখনও হাঁটি, জীবনের পথ শেষ হওয়ার নয়, তবে চলার পথে আমার অতীতের স্বরূপ কারোর রূপে প্রতিফলিত হলে, পথ আটকাই তার।

সবাই গ্রাহ্য করে না, অনেকে এড়িয়ে যায় অনেকে আক্রমণ করে। কিছুজন তবু সাড়া দেয়, চারদিনের জীবনে প্রাপ্তি বলতে এটুকুই।

খোঁজ ■ সৌরভ রায়

তোমায় খুঁজতে গিয়ে কেবলি
হাতড়ে হাতড়ে মরি,
তুমি দূরে সরিয়ে দাও;
সুতোয় বাঁধা শূন্য
আকাশের ঘুড়ি।
কেটে গেলে উড়ে যাবে,
তুমিও তাকে
একসময় ভুলে যাবে,
তবুও আটকে রাখা।

অচ্ছুৎ ■ বিকাশ যশ

আকাশ হতে বৃষ্টি ঝরে প্রবল বরিষণে
চুপটি করে আছি বসে ছোট্ট ঘরের কোণে।
সারা দেহে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছে থর থর
দারিদ্রতার দুঃখ যত হচ্ছে বুকে জড়ো।
রৌদ্রে পোড়া শরীর মোদের কদাকার কিম্ভূত
আমরা কি ভাই এই পৃথিবীর এতই অচ্ছুৎ।

দারিদ্রতা কী ■ নিরুপম পাল

তুমি দেখেছো কি রেলস্টেশনের পাশে
ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার?
দেখেছো কি ফুটপাতে নর্দমার ধারে
মানুষ গরু একসঙ্গে শুয়ে আছে?
ডাস্টবিনে থাকা খাবার নিয়ে
মানুষ কুকুরের টানাটানি
দেখেছো কি?
দেখেছো কি ভিখারিণী মায়ের সন্তানের
এক মুঠো মুড়ির জন্য কান্না?
জানতে চেয়েছো কখনও দারিদ্রতা কি?

অণু কবিতা ■ এক লাইনের কবিতা

আমি আমার আর আপনি আপনার?

ঠিকানা ■ হাসনাহেনা রানু

তুমি আকাশ, রয়েছ এক পৃথিবীর দিগন্ত জুড়ে...
আমি মেঘ, আছি শুধুই তোমার বুক ছুঁয়ে...
এখন বৃষ্টির কান্না আমার শেষ ঠিকানা!

আমি হতে চাইনি কোন কারুপল্লীর
অন্ধবিকেল, চুড়ির নিক্কন,
শুধু তোমার ফেরার অপেক্ষায়
সেটুকু ও ক্ষীণ প্রায়;
ভর ও ভারের অবলম্বনে
নিক্ষিপ্ত এই আমি ঝরাই
অবিরত অশ্রু ক্ষরণ...

অণু কবিতা ■ খুঁজি

শুধু অপলক পাথর দৃষ্টিতে খুঁজি একমুঠো শৈশব।

ফিরে দেখা জীবন ■ শ্যামল কুমার রায়

জীবন মানে জল ছবি প্রেম প্রেম খেলা।
প্রেয়সীর মুখ দেখে কাটে সারা বেলা।
মুখোমুখি পাশাপাশি কত কথা হয়
সব কথার মানে বোঝার এ বয়স নয়
উঠতি বয়সের প্রেমে আবেগের কারকতা
যৌবনের প্রেম খোঁজে উদ্দাম যৌনতা।
মাতৃত্বে নারীরা পায় পূর্ণতা
পিতৃত্ব জাগিয়ে তোলে দায়বদ্ধতা
বয়সের সাথে সাথে বোঝাপড়া বাড়ে
ভালোবাসা একঘেয়ে অভ্যাস গড়ে।

অণু কবিতা ■ সম্পর্ক

সম্পর্কের মাঝেও উষ্ণতা থাক, সম্পর্কের শীতলতা পুরোপুরি উবে যাক

হতভাগ্য ■ অভিজিৎ মান্না

এ এক হতভাগ্যের গান
বিছানো কাঁটারা
রোদেও বিষ
ঝড়তত্ত্ব
কোথা থেকে যে উড়ে উড়ে আসে
ধূসর ছাই জমতে থাকে সকালেও
কার অভিশাপ? হলুদ কষ্ট যাপন
এগানোর প্রয়াসে হাঁটি রোজ
অশ্রু জলে অতীত দম্ভ ডোবে
আম্রবন সে তো গল্পে শুনি।

পথিক ■ বিদ্যুৎ মিশ্র

অনেক রক্ত ক্ষরণ বয়ে চলে
ধমনী শিরায়। বুকের মধ্যে
জমা হয় সুপ্ত আগুন।

এই শ্রাবণধারা হয়তো আর আসবে না
মৃত আগ্নেয়গিরি কথা রাখেনি
দূরে ছড়িয়ে যায় উতপ্ত লাভা।
ভেঙে দেয় কালের প্রাচীর। তাই
হয়তো আর ফুল ফুটবে না।

আকাশে বাতাসে যখন তুমুল ঝড়
ঘরের দরজা খুলে পালিয়ে যায় উদ্বাস্তু পথিক।

বাস্তবের মরুভূমি ■ ইতিকা বিশ্বাস

আমার জীবনে বাস্তবের মরুভূমি হাহাকার
হৃদমাঝারে বিষাদের ক্লান্তিতে কালোছায়াময়
দুর্বার গতিতে কল্পনা বাস্তবের স্বপ্ন বাধাপ্রাপ্ত
আঁখির পাতায় জলের ধারা ফেলে আসা দিনের।

অসম্ভব সম্ভব হার জিৎ ঘৃণা ভালোবাসা একত্রিত
চক্রাকারে আবর্ত ক্ষুদ্র জীবন চক্র পরিসরে ঘেরা
সঠিক পথের দিশার উপায় যখন বন্ধ
জীবনের মায়া ঘৃণায় ভরে ওঠে মুক্তি চায় বন্ধন
তিরস্কারের প্রতি পদক্ষেপ পুরস্কার রূপে গ্রহণ করে
তখন এসো মরুভূমির বুকে স্রোতের শান্ত ঝর্ণা হয়ে।

অণু কবিতা ■ এসো

আমার বাস্তব জীবনের মরুভূমিতে তুমি এসো ঝর্ণা হয়ে।

প্রতিটি ঋতুতে জেগে থাকি ■ নিজামুদ্দিন মণ্ডল

আমার বাড়ি নেই
একটা খোলা আকাশ আছে
বসন্তের প্রতিমুহূর্তে   জানান দেয় বেদনার

অহেতুক তোমায় ভালোবাসি
তোমার চোখে আমি ডানাহীন পাখি
আমার নাচ হয় না
আমার ঘুম হয় না
অকারণ জেগে থাকি প্রতিটি ঋতুতে

অণু কবিতা ■ প্রেম

প্রেম আসে যায় সম্পর্ক কখনোই ভাঙে না কারোর অকারণ, কাঁদে স্মৃতি

এক লাইনের কবিতা ■ শান্তনু গুড়িয়া

অন্ধগলি ডাকে পথের বাঁকে

জননীর প্রতি ■ অঙ্কিত রায়

যেদিন কাঙাল করেছো আমায়
দুঃসময়ের মুখোমুখি আমায় পাঠিয়েছো
কোটরাগত দ্বীপে
ভাদ্রের ঘুণচোষা দুপুরে
মাতৃভূমিকে করেছো সৎকার বিহীন রিক্ত মরুভূমি—
সেইদিন কাদামাখা অবেলায়
জানাজানা দেওয়া কবর ফুঁড়ে
উঠে এসে বলেছি—
'হে আমার পুতিগন্ধ প্রসবিনী অপচয়ের পৃথিবী,
তোমায় বড় ভালোবাসি।

আসুক ■ দিলীপ

এসেছে সময় বজ্রসম, গর্জে ওঠার দিন
আর কতকাল, থাকব আমরা, থাকব অর্বাচীন
হুঙ্কার দিয়ে, আসুক না ঝড়, আসুক অকস্মাৎ
মুছে যাক যত নিবিড় আঁধার, যত আছে সংঘাত
আর কত হবে, হয়েছে অনেক
হয়েছে সর্বনাশ
আমরা কি তবু, পড়ে রব শুধু
হয়ে জীবন্ত লাশ?

কবির দেশে ■ আশীষ ঘোষ

এসো বন্ধু বসি ক্ষণকাল এই তরু তলে,
যেখানে একদা বসেছিলেন কবি।
এ বৃক্ষছায়ায় আজো তার ছায়া পড়ে,
তৃণভূমিতে দেখি তার পদচিহ্ন
কান পেতে শুনি কত চেনা সুর ভাসে
কত কবিতা লেখা আছে পাতায়-পাতায়
এখানে প্রকৃতি অকৃপন দু'হাতে বিলায়
যা আছে তার ভাণ্ডে।
বাউলের একতারাটি ডাক দিয়ে যায়
আয় ফিরে আয় আমার কোলে।

পোস্টমর্টেম ■ আভা সরকার মণ্ডল

সকল কর্ম হয় ছেঁড়াখোঁড়া
অচেনা জন পোস্টমর্টেম ঘরে,
সুচের ফোঁড়ে যতই ঢাকো জোড়া
জন্মের দোষ সাথে সাথে ওড়ে।

লাল দাগটি পড়ে কর্মের খাতায়
অসমাপ্ত বিচার শূন্যে কাঁদে,
রোদ-বৃষ্টির দাগ, ফুটে থাকে পাতায়
জীবন দর্শন আজ শূন্যের ফাঁদে

অণু কবিতা ■ হাসি মুখ

এক থালা ভাত, ক্ষিদের পেট, হাসি মুখ।

নেই সমবেদনার ■ কৃপান মৈত্র

বৃদ্ধাশ্রম, নতুন ঠিকানা। অপরিচিত কিছু মুখ,
দৃষ্টিতে বিভ্রম, অথচ এমন হওয়ার কথা নয়।
শামুকের মতো আত্মস্বার্থতার আওতার শিকড় শিথিল
ঘেরাটোপে নিশ্চিত জীবন। ঝড়ের আঁচ
যে পায়নি সে ঝড়ের বিপন্নতা কী বোঝে।
আমার আমিত্ব ঘেরা একক জীবন। এখন সঙ্গীউদাস দৃষ্টি
কড়ি বরগা, ঝাপসা দৃশ্য, পাখির বিরক্তিকর কাকলি,
অথবা বিভ্রম আলাপচারিতা। প্রথামতো কিছু স্তোকবাক্য
পাশের শূন্যখাটগুলোর লোলুপ দৃষ্টি
শুষ্কচোখে অশ্রুঝরে কেউ নেই সমবেদনার।

অণু কবিতা ■ সিদ্ধি ■ কৃপান মৈত্র

বিকল্প সংকল্প সাধনায় একমাত্র সিদ্ধিলাভ নয়।

শুধুই তুমি ■ রণিতা মল্লিক

তোমার শান্ত উষ্ণ চোখের ধোঁওয়া
আমি নিরবে মেখেছি হৃদয়ে,
মনের মাধুরী মিশিয়ে ভালোবেসে যাই
নির্জনে, শুধু তোমাকে—শুধু তোমাকে।
তোমার মনের গোপন সাগরে ডুব দিই আমি,
ভাসিয়ে রাখি আমার ফুল্ল সাজানো হৃদী ভেলা—
তোমার তুমিকে আমি নিয়েছি কেড়ে,
আছে শুধু তোমার এলো ভিজে চুলে ঢাকা মনের জানালা।

অণু কবিতা/রাতে ■ আনোয়ার আবদুল্লা

রাতের ছাদে রোজ গল্প করি আমি আর নিঃসঙ্গতা

কৃষ্ণ-না ■ নিসর্গ নির্যাস মাহাতো

পিচ রাস্তা ছাড়িয়ে রাঙা মাটির ধুলোয়
রোজ হারিয়ে যেতে দেখি বিষণ্ণ সুর
যেখানে উদাসীন ঘাসে ঝরে পড়ে বিশ্বাস
আশাহীন প্রতীক্ষা
কী আকুতি কী প্রেম!
এত আকুলতা মনে শুধু আছে পোষা
কান্না চাপা দুর্বলতা টেনে ধরে হাত
কি হৃদয় হলে পরে বোষ্টমী কাঁদে
আমরাতো কেউ খুঁজিনা প্রেম
অঙ্ক করেছি খুব।

ভাবনার ছবি ■ প্রণব কুমার চক্রবর্তী

ভাবনাগুলো সব মধ্যবিত্তের স্বপ্নের মতো
ভাঙাচোরা বিপর্যয়
নিজস্ব সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে বহুদূরে গিয়ে
লুকিয়ে চুপিসারে কথা বলে নিজেই
নিজের সাথে....
কথাগুলো সব রাগ অভিমান আর
মনখারাপের কথা.....
সেইসব ভেজা পোড়া গল্পকথা
বাতাসে ভেসে ভেসে মেঘ হয়
ফিরে আসে বৃষ্টি হয়ে

অণু কবিতা ■ শেষের কবিতা

হাওয়ার সাথে হাওয়ার এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবো আমরা গুষ্টিসুদ্ধ

অঙ্কুর ■ বিষ্ণু চক্রবর্তী

এভাবে এগিয়ে যাবে সময়।
চাওয়া পাওয়ার হিসেব
ওলোট পালোট করে,
নদীর জল ছাপাবে দুকুল

আমার কথাগুলো
ডানা মেলে উড়ে যাবে
তোমার আকাশ জুড়ে।
সময় গড়াবে, আর
ভরে যাবে শুষ্ক মাঠ
ভালোবাসার অঙ্কুরে।

নাগপাশ ■ জুঁই রায়

কালকে আমি সেই শাড়িটা, তুইও তো সেই পাঞ্জাবিতে
বুকের ভেতর রিমঝিমঝিম....ভালোবাসায় ঘুণ ধরেছে

প্রতিদিনই যেমন দেখি কালও তেমন দেখার ঝোঁকে
যেই না গেছি, চোখ রেখেছি, চোখ পড়েছে তোরই চোখে

ফেললি দেখে বুকের ভেতর? অজানা ভয় খাচ্ছে কুরে
যতই জানিস যতই দেখিস একশো যোজন থাকিস দূরে

তুই আমাকে বলেছিলি আমি নাকি আবেগে বই
বুকের ভেতর লুনি নদী স্রোতের তবে অভাবটা কই?

এখন বুঝি, তোরই খেয়াল— যখন যেটা ইচ্ছে করে
অথচ এক অদৃশ্য জাল আমায় শুধু জাপটে ধরে

সম্পূর্ণ আমি ■ সুজিত ভট্টাচার্য

বিদায়ী অমাবস্যার রাতে অত্যন্ত গোপনে
নিঃশব্দ এসেছিলে তুমি
আমাকে ভেজাবে বলে

অনন্ত অভিমান বুকে চেপে সহস্র রজনী
প্রতীক্ষায় আমার প্রতিটি মুহূর্ত
তমসার অন্ধকারে ভেসেছিল বাতাসে

আমি তো মৌন তটিনীর মতো একান্তে
নিজেকে উজাড় করে
তোমাতে লীন হতে চেয়েছি বার বার

আজ সম্পূর্ণ আমি তোমার বৃষ্টি ধারায়

অণু কবিতা ■ অমিল

বসন্তের শেষে ব্যর্থ সব হিসেব নিকেশ

অন্বেষী ■ মনোজ জানা

নদীটি শুকিয়ে গিয়েছে

তার প্রেমিক মরুভূমির বালি সরিয়ে খুঁজছে সুগন্ধ স্তন,
রোদ্দুরে ভিজে গেছে বন।
পাহাড়ি কুকুরের মুখে ঝরছে লালা, বন্ধুরা গিয়েছে মেঘ-শিকারে,
অন্য পুরুষের সাথে হারায়নি নদী—বলি কি প্রকারে!
তৃষিত পথিক পথ হাঁটে মরীচিকার লোভে
বজ্ররা শাসায় তাকে—দোপাটি ফুল শুকায় টবে।
দাবানল এগিয়ে যায়, বায়ুতে ছড়ানো পেট্রোল
পথটা কঠিন, প্রশ্নটাও— গোষ্পদে বাসা বাঁধে কর্মফল,
কেঁদে কেঁদে উটেরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

অণু কবিতা ■ যে জ্বলে

সে জ্বলে, জ্বলতেই থাকে, নেভার কথা ভুলে যায়।

স্মৃতির সরণীতে ■ বিনয় ভড়

চিরাগের শেষ স্পর্শ মেদুরতায়—
ছটপটানি বাতাসকে সঙ্গী করে
তমসা এসেছিল স্মৃতির সরণীতে।
হালকা একটা অনুভূতির ছোঁয়া
ঢেউ দোলানো স্পর্শ—
আচমকাই যেন একটা কঠিন হৃদকম্পন
বেহুলার জলে এ কোনো পল্লীবিদ্যুৎ
না জানি তমসাই কী এসেছিল পাশে—
কুড়ি কুড়ি বছর পর
আবার স্মৃতির সরণীতে।

আলো ■ পিনাকী বসু

ঊষার আলোয় কাঁকড়াগুলো তীরে বসে স্বপ্ন দেখে,
ঢেউয়ের রাশি ভীষণ খুশি আপন মনে উল্কি আঁকে।
স্বপ্ন দেখা আগুনপাখি, বুনছে নিজের রক্তমালা,
আগুন কোথায় জলের নীচে জ্বলছে বুকে দারুন জ্বালা।
রক্ত মালার রঙ যে ছড়ায় অস্তাচলের আকাশজুড়ে,
অবাক শামুক খোলস ছাড়ে মাথা মুড়ে শীত চাদরে।

মনের মাধুরী ■ দুলাল সুর

তোমার আশায় দাঁড়িয়ে আছি দুয়ার খুলে
দেখব তোমায় জ্যোৎস্নামাখা চাঁদনী রাতে
মন মাধুরী দিয়েছে ডুব প্রেম সাগরে
ভালবাসার সঞ্জীবনী আনবে বয়ে।

আশা ■ কল্যাণী মণ্ডল

না পাওয়া ভাবনাগুলো উড়ে বেড়ায় এলোমেলো,
যন্ত্রণাময় জীবনের সাত সমুদ্র পার হয়ে যাই।
অন্তরে অনন্তকাল ভালবাসার জ্বলুক চিতা,
চক্ষু মুদে রূপকথার স্বপ্ন লোকের আকাশ ভরায়।
রাগ অনুরাগ, মান অভিমান, মন পাহাড়ে বসত গড়ে
স্মৃতিগুলো হৃদয় মাঝে আঁকতে থাকে জয় পরাজয়,
স্পৃহা তনু পরাগ মেঘে অনুরাগে রাঙায় হিয়া
মনে মনে প্রেম চুম্বন কল্পনাটা নগ্ন না নয়।
অঙ্গ নিয়ে রস করার, সঙ্গ সুখের সঙ্গী তো নাই
তায় ভগ্ন হলো, আশানুরূপ অনুভবের স্বপ্ন সানাই।

মানুষ ■ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী

গর্ব করে যদিও বলি আমরা মানুষ।
স্বার্থের কাছে মানুষেরা হারায় যে হুঁশ।
জাতের কথা ভেবে বলি আমি উঁচু
তুমি নিচু—
অনেক বেশি ভেবে হারিয়ে ফেলি
অনেক কিছু
যদিও বলি আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান
আল্লা ঈশ্বরের সৃষ্টিতে মানুষেরা সবাই সমান।

রূপান্তরিত ■ স্বর্ণকমল তপস্বী

প্রসূতি গরিমার চাঁদের হাট
গমগমে সভা ঘরে ব্যক্তিত্বের আত্মজ এক পাঠক্রম
তীর্যক দৃষ্টির ঋজুতা
কনুইয়ে মুখগুঁজে শিখে নিচ্ছে কান্নার রোল
তবু মাঝে মাঝে
দু–একজন ব্যতিক্রম
স্তিমিত করতালি লিখিত পরিক্রমায়
একজন রূপান্তর কামনা।

দূরাভাষ ■ অনিল দাঁ

রাজপুরোহিতের আবক্ষ মূর্তির কাঁধে চেপে
ফুলকাটা শীতবস্ত্র, সিন্ধু সভ্যতায়
দেখলেই চেনা যায় এ কাশ্মীরি শাল।
মহেঞ্জদড়ো থেকে মহাভারত পড়তে পড়তে
ডিজেল ইঞ্জিনের রাজধানী ভ্রমণ
স্টেশনে থেমে সকাল,
অনেকের জীবনেই বুকফাটা কান্না
স্মৃতিকাতরতা
শৈশবে থেকে যৌবন বুড়ো হয়ে ওঠা
ধুকপুক দূরাভাষ শব্দ।

অণু কবিতা ■ ভালোবাসা

ভালোবাসার রেশ অনন্ত।

অণু কবিতা/তুমি ■ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

আমার কবিতায় তুমি হৃদয়ের সাত রঙে আঁকা।

আমরা সকলে ■ বিক্রমজিৎ ঘোষ

তুমি ও আমি
তোমরা আর আমরা
আজ সকালে যেন
শাহজাহান-জাহানারা

চন্দ্রজস্নান ■ রথীনপার্থ মণ্ডল

কোজাগরী স্তব গাথা
নদীর পাড় ঘেঁষে চলে গেল
এ-মুহূর্তে উদোম ঢেউ

আমি তুমি অপলক
মৃত্যুর স্রোত থেকে তুলে নিচ্ছি
প্রেমরেণু।

অণু কবিতা ■ ফকিরচাঁদ

শিকল ভাঙার গান কি শুনতে পার ফকিরচাঁদ?

নিস্তব্ধ সমুদ্রশহর ■ নির্মাল্য মণ্ডল

চন্দ্র প্রহরায় নির্ঘুম নক্ষত্র
ঝাউয়ের ঝিরি হাওয়ায় শান্ত বালিয়াড়ি
সমুদ্র জল ডাকে জোছনার আলো
নিশাচর যাত্রার পদধ্বনি কর্ণকুহরে
নিস্তব্ধ নীরবতায় সমুদ্র শহর

সুখের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে পৃথিবী
অবাক নিঃস্বরতায়
.....হয়তো তুমিও।

অণু কবিতা ■ অনামিকা

অনামিকার জন্মে আমি অনামিকায় হারিয়ে যেতে চাই।

উদাসীফুল ■ অমিতা মোড়ল (সরকার)

সময় সব আজ নিয়েছে কেড়ে
পারবো কথাটাই না পারার বেড়াজালে।
চারদিকে শুধু ভয়ঙ্কর একাকীত্ব,
পথ আগলে দাঁড়ায় দিবারাত্র

দীর্ঘ সময়ের অচেনা দাসত্ব
এক সময় বুঝি সে ও লাগে ভালো।
উদাসী ফুলেরা সব ওঠে ফুটে
জীবনের সব রঙীন স্বাদ পেতে

শূন্যের রঙে সব হারানো মনটি
আজও খুঁজে বেড়ায় সেই নিষ্পলক দৃষ্টি।

অণু কবিতা ■ জীবন

যদি জীবন এরকম হয় তবে আর জন্ম নয়।

অণু কবিতা ■ প্রদীপ মণ্ডল

লোকে লোকে লোকারণ্য তবু আমি একা।

একদিন সব মুছে যাবে ■ বি. কে. স্বপন

পরাধীনতার অক্টোপাসে একবার যদি ধরে,
অসহায় ইচ্ছেরা ক্রমশ জড়ত্বে বিশ্বাস করে।

বৃত্তের মাঝে ঘড়ির কাঁটা আজীবন শুধু ছোটে,
সরণশূন্য পথ চলায় সেও ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

সময়ের গায়ে জং ধরে, ছানিপড়া ক্ষীণদৃষ্টি
মিথ্যে রোদের নকল হাসি, ভিতরে অঝর বৃষ্টি!

বৃষ্টি, কী বৃষ্টি। কেউ জানে না, অদৃশ্য ভাঙন বুকে,
ইচ্ছেরা তবুও বেঁচে থাকে অলীক মায়ার সুখে।

অবশিষ্ট আধপোড়া কাঠে ইতিহাস লেখা রবে,
একদিন তা-ও মুছে যাবে আঁধারের উৎসবে।

ঢেঁকি গড় নাড়া ■ অসীম দাস

ভালোবাসার জন্মদিন নেই।
ভালোবাসার মৃত্যুদিন নেই।
মাঝখানে লালনের স্মৃতি।

অজানিত ভাস্করের ভাঙচুর শ্রমে
কালঘাম, ঠুকঠাক,
ঢেঁকি গড় নাড়া।

ছটফটে চড়াই উৎরাই
টানাটানি জোয়ার ভাঁটা
পর্বত শিখরে জয়ের পতাকা নেড়ে
কোটরের শীতঘুম কিন্তু।

অণু কবিতা ■ ভালবাসা

ভালবাসা জেগেই আছে তাইতো সকাল হলো

রোদের সম্মোহন ■ সোমনাথ চক্রবর্তী

রোদ এসে মুখ রাখে, কাচের বুকে।
আমাদের চোখের লবণ মেশে,
ঝাপসা বিন্দুর নিঃশ্বাসে।
বুকের জল স্বাদহীন হতে হতে,
স্বাদকোরকের অচেনা পথে বন্দি।
বর্ণবিলাসের সুখের স্বচ্ছতায়
বেঁচে আছে কালি।
শ্রাবণ এসে নিয়ে চলে যায়
স্তব্ধ ঘাম।
ছড়িয়ে যায় ফিনকি দিয়ে যন্ত্রণার সুখ।

অণু কবিতা/চলাই জীবন ■ সুপ্রভাত মণ্ডল

জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে থেমে গেলে পরাজিত।

লেজের পিঠে লেজটা বেঁধে ■ সুজান মিঠি

জন্মেরা সেই ছুটছে ঘোড়ায়
লেজের পিঠে লেজটা বেঁধে
সুরকি নুড়ি কুড়িয়ে থলেয়
গাঁথছে গায়ে নিজেই সেধে।
পুঁজ বিষিয়ে পচন লেজে
জীর্ণ প্রাচীন বৃদ্ধ খসে,
ঘোড়ার লেজে ছুটতে আবার
অন্য জন্ম উড়ে বসে।

অণু কবিতা ■ সাঁকো

এক গোধূলির আলোর চুমুক, জিভ এবং হৃদয়কে বাঁধে লতায় পাতায়

তুমি ■ বটুকৃষ্ণ হালদার

কবিতা তুমি চুরি হও নিয়ত, আমায় কি দেবে ধরা?
সীমান্ত শেষে খুঁজতে গিয়ে, হয়ে গেছি মনমরা
কবিতা তুমি ভেসে বেড়াও, নীল দিগন্তের মাঝে
কবিতা তুমি আজও বেঁচে আছো, বনলতার শাড়ির ভাঁজে
কবিতা আজ তুমি কেন মনমরা, কেউ কি তোমায় বোঝে?
ভাবনা বিহীন তাই তো তোমায়, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ রা খোঁজে
কবিতা তুমি সংস্কৃতির ঢেউ, শুরু হতে শেষ প্রান্ত
খেয়ালীর সুরে ডাক দিয়ে মন, কবি নজরুল সুকান্ত
কবিতা তুমি বিবাগী বাউল, নদীর আধ ভাঙা ঢেউ
বনফুলের পাপড়িরা বড় অসহায়, কবিতা খবর রাখেনি তো কেউ।

শেষ সংক্রান্তি ■ সমীরণ দাস

সারাটা বছর কেটে গেল আজ, পাওয়া না পাওয়ার সুরে
নতুন বছর আসছে দেখো ওই ক্ষণিকের দূরে।
আজকে দিবস বিদায় যে চায় শেষ রজনীর আলো;
বললো যে সে নতুন দিনে, নূতন করে জ্বালো।
ভুলে যেয়ো যত দুঃখ ব্যথা আনন্দ আর গানে
জাগুক নতুন দিনের আলো, সকলের প্রাণে প্রাণে।
আসুক সবার হৃদয়ারণ্যে সকল দিনের শান্তি
নতুন বছর নতুন দিনে আজ শেষ সংক্রান্তি।

বৈপরীত্য ■ আসিকার রহমান

তোমার মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিলো আমার মধ্যে নয়
একই রেখায় অল্প সময়
দ্বন্দ্বহীন হলে তুমি আমি দ্বন্দ্বময়

আলোর খোঁজে তরুণ ■ সুমিত দেবনাথ

ছোট্ট ঘরে বন্ধ হয়ে কুয়োর ব্যাঙটি হয়ে;
কেন থাকিস কচি-কাঁচা তরুণ ছেলে- পেলে?
আয়রে তোরা ছুট্টে আয় অজানাকে ধরতে আয়
অচেনাকে চেনার নেশায় দূয়ার খোল রে হিয়ার।

মনের যতো বাধা নিষেধ; খোলো জানালা দরজা
বাহির হতে হাজার শত আলোর দেওয়া নেওয়া;
হিয়া—কুঠিরে জাগলে করুণ আলোোর আভা;
তরুণ আমার সমাজটাতে ভরবে আলোর কায়া।

স্বেচ্ছা নির্বাসন ■ ডালিয়া মুখার্জী

দিগন্ত-প্রসারিত শূন্যতায় আমি আজ মেনে নিয়েছি স্বেচ্ছা-নির্বাসন।

মহীয়সী ■ পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়

ইদানিং কেউ আমাকে দোলনচাঁপা সুখ দিচ্ছে
একটা মিহি আলোয় জড়িয়ে ধরছে যোজন দূরত্ব
সংযম হারিয়ে আমিও মুহূর্তে হয়ে উঠছি মহাকাশ
চারপাশে বিন্দু বিন্দু স্বেদ ঝরছে
নক্ষত্রের আবির্ভাবে কপালের চাঁদও যেন অস্থির পঞ্চম
সে সুখে চোখে নামছে ঘুম
মৃতপ্রায় অন্ধকারেও স্থবির সুখ
গোলাপী জ্যোৎস্নার রঙের একাকীত্ব ঘুচে
আমিও হয়ে উঠছি মহীয়সী।

আমি তোমাদেরই ■ ঘনশ্যাম কল্পতরু

পথ চলতি
নিভৃতে একা
প্রতিবাদে প্রতিবাদে ব্যাপ্ত করেছি ধূসর পৃথিবী।
মায়াবী রাতের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে
প্রদীপের আলো আর রসদ ভরা গাঙ।
রাজনীতির পাদ প্রদীপে থাকতে থাকতে
একদিন মুষ্টিবদ্ধ করেছি তাকেই।
শান্তির গলাটিপে থামিয়ে দিয়েছি
গ্রহদের নড়াচড়ার অবাধ গতি।
ক্রমশ পালোয়ান থেকে বৃহৎ বন্যপ্রাণী

পথ ■ রাহাত রাব্বানী

তুমি যেদিকেই হাঁটো সেদিকেই
জন্ম নেয় এক একটি সবুজ পথ।

অথচ এসব পথ—
আমার বক্ষপিঞ্জরের ভেতর ঘুমিয়ে থাকে,
নীরবে।

তুমি আমার বুকে পা ফেলে
দিব্যি চলে যাও...
মুড়মুড় আওয়াজ তোলে ১২ জোড়া পর্শুকা।
তুমি ফিরেও তাকাও না...
আমি লিখি তখন, আমাদের ভালোবাসার অসম গল্প।

অণু কবিতা ■ শেষ বিবৃতি

যতদূর মনের বিস্তৃতি, ততদূর ভালো থাকা হয় যেন।

আড়াল ■ দূর্গা শংকর দাস

আড়াল খুঁজে এগিয়ে দেখি
সরে যায় গ্রাম্য পথ, ধানজমি, আটপৌরে লোকালয়

খানিক দাঁড়িয়ে বুঝে নেওয়ার গোপন প্রচেষ্টা
কাছে পিঠের কোনো আশ্রয়

রাস্তায় একটি কুকুর দৌড়াতে দৌড়াতে থামলো
একবার ফিরে তাকালো আবার এগিয়ে গেল

মেঠো ইঁদুরটি খাদ্যের সন্ধানে চুপিসারে
এদিক ওদিক চলাফেরার শব্দ সাবধানে শুনছে
আর নিজের গর্তে প্রবেশের সময়
কিছুটা মাটি তুলে রাখলো মুখটাতে।

অণু কবিতা ■ ছল

ছন্দ শুধু ছলই করে ছন্দের হিসেব মেলে না।

ফল্গুধারা ■ কার্ত্তিক মণ্ডল

আর কতদিন......
লজ্জার অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবদ্ধ রাখবে
শূন্য হাওয়ায় আর কতক্ষণ দম বন্ধ করে থাকবে কনকমতী?
তোমার ভেতরের শক্তি কি সত্যি মরে গেল?
নিজেকে বারবার ধর্ষিতা হতে দেখেও.....
চুপ করে রবে, নিরবে।
গর্জে উঠবে না....
অহল্যার পাষান ভেঙে মুক্ত করবে না নিজেকে
ছিন্নভিন্ন করবে না পৃথিবীর অবাঞ্ছিত সব রূপ
মরুভূমির বুকে বয়ে যাক নব উল্লাসের ফল্গুধারা।

ভূস্বর্গ ■ মনোময় ঠাকুর

পৃথিবী স্বর্গ পৃথিবী নরক
প্রত্যেকে করে নিজের পরখ
হেথায় জন্ম হেথায় মৃত্যু
গড়ে জীবনের দ্বন্দ্ব।
আত্মা মোদের নিরাকার
দেখেনি তারে কেউ
নশ্বর দেহ পড়ে থাকে
বলতে পারে না জন্ম মৃত্যু কেউ।
স্বর্গ মানব দেখেনি কখনো ভূ কে যায় ভুলে
এটাই স্বর্গ এটাই নরক দিবস যায় চলে।

অণু কবিতা ■ সুখদুখ

সুখ দুখ পূবের কিরণ রাজি পশ্চিমে কাঁদে।

সে সন্ত্রাসী নয় ■ দীপকুমার

জনতার বক্ষে
তুমি যাকে গুলি ছুঁড়তে দেখছো
তুমি যাকে বোমা ছুঁড়তে দেখছো
সে সন্ত্রাস নয়—
সে সন্ত্রাসী নয়—
আসলে ওদের বাধ্য করা হয়,
বাধকরা-ই প্রকৃত সন্ত্রাসী
হয়তো বা সমাজে তাঁদের আছে সাধু পরিচয়।

মালীবুড়ো ■ সুশান্ত সৎপতি

শহর থেকে পালিয়ে, ভীড় থেকে পালিয়ে রাস্তা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে লোকটা
তার গায়ের উপর বেড়ে উঠছে লতা, এসে বসছে পাখি
তার চারপাশে জড়ো হচ্ছে আত্মীয়ের মতো গাছেরা
আমরা তাকে মালীবুড়ো বলে ডাকি তিনি পাতার মর্মরে সাড়া দেন।

অনুর্বর মুকুল ■ মোহাম্মদ আবির

ডানাভাঙা দোয়েলের সাথে
হেঁটে আসে সংবাদপত্র,
সবটা জুড়েই লিখা থাকে
মাউন্ট এভারেস্টের ইতিবৃত্ত।
নিকট অতীতে মেতেছিলো সে,
হ্যালোইন উৎসবে।
হলুদ রঙ অপছন্দ করে বলে,
তার গায়ে আজও
চড়ে না সবুজ চাদর।

কেন দূরে থাকো ■ সৌগত দাস

এবার তোমায় আসতেই হবে
আড়াল রইলে চলবে না...
দূরে থেকে দেখবে শুধু
মুখে কিছু বলবে না!

জাগি আমি তুমিও জাগো
শুধুই মনে স্বপ্ন আঁকো
পাগল শীতের জোছনা রাতে
পাশে কেন ডাকবে না?

এবার তোমায় আসতেই হবে
আড়াল রইলে চলবে না...

আবিষ্কার ■ সৈকত দাস

শত সহস্র নক্ষত্রের মাঝেও নিজেকে বারবার আবিষ্কার করি কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র রূপে

সুখ ■ চান্দ্রেয়ী দত্ত

শরীরে আর অসুখ আছে কিনা জানিনা
অসহ্য সুখের মতো
বুকে মুখ রাখলে নেশা হয়,
আলতো তুমি গন্ধতে।
আরো নেশা হয় প্রগাঢ় হৃদকম্পে,
সকালগুলো আরো হাতড়াই
ভালো থাকার বিনিময়ে।

দোটানা ■ শিবশঙ্কর বক্‌সী

চলছিল দোটানা কে কাকে, কেমন করে বলবে,
বলতে পারে না— কি জানি কে নেবে কিভাবে।

মেঘের খুব ইচ্ছে, বৃষ্টি হয়ে ধরার বুকে ঝরবে,
ধরিত্রীও চাইছে মেঘ বৃষ্টি হয়ে সবাইকে ভেজাবে।

মেঘ বলতে পারে না, গজরায় গুরু গুরু
ধরিত্রী ভাবে এবার তাহলে বৃষ্টি হবে শুরু।

মেঘ বজ্রকে পাঠিয়ে ধরিত্রীকে দেখায় দারুন ভয়
মেঘ থেকে বৃষ্টি নাববে ধরিত্রীর খুব আনন্দ হয়।

দু'জনেই দোটানায় ভোগে, কে কাকে কি বলবে,
বলতে পারে না, কি জানি কে কিভাবে নেবে।

অণু কবিতা ■ সময়

পঞ্চান্ন বছর একসাথে থেকে ইলেকট্রিক চুল্লি দু'জনকে আলাদা করে দিল।

কিছু মনে করো না ■ উৎপল সিন্‌হা

এমনিতে তো সবাই আমার আত্মীয়।
পুত্র মিত্র ভাইপো ভাগ্নে
সবারই আমি কেউ না কেউ হই।
কিন্তু কলম যখন ছুঁই
তখন কেউ আমার নয়
আমিও কারোর নই।

ঘনায় আকাশ ■ সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল

মুক্ত বেণীতে ঘনিয়ে আকাশ
বেদনার বৃষ্টি রসে ঝিলমের রক্ত জল
খোলা জানালার পাশে পলাশ ঝরছে
কপালের রক্তিম গ্রহ মিশেছে মাটিতে
বারুদ গর্জনের সাথে হাতের শাঁখার
কি যোগ আছে বলো!
মোমবাতির আলোয় শিশুর মুখ
গণ্ডদেশে প্রবাহমান ধারার সাথে
ভাঙা প্রস্তরের মিল কী নাই বলো!
শেষ রোদ মিশেছে পাখির ডানায়।

ডানা ■ ভীম ঘোষ

রঙের কোনো অভাব নেই জানি
বাঁশের পাতায়, সোনা ঝুরির
সবুজ কোনায়, প্রাচীরে শেষ কার্নিসে,
জলে ঢেউ খেলে যায়, তোমার ছবি।
চার প্রহরে ভোর, জেগে ওঠে মাচায়।
এ পৃথিবীর গতিপথে, নিজেকে জেনেছি।
আছাড় খাচ্ছে বুক, কোনো এক বোধে।
অপেক্ষা বসে, রঙিন ডানায়, দেব পাড়ি।
মহাকালের সন্ধানে।

সুপ্রভাত ■ সুনিতা

নূপুরের নিক্কনে মোহ সুর আবেশে
ইথারের ধ্বনি মন বাঁধা মায়াজাল
স্বপ্ন প্রেমিক, প্রেম কাশ দোলার তাল

আমার শুভ রাত ধ্রুপদী সংলাপে
তবলার মিঠে বোল, শুকতারা আলাপে
রংধনু আঁকা পথ, জিন-চিরাগের আলো
ক্ষত আছে, আছে আবেগ সমস্ত নিউজরুম জুড়ে

একটু আলোর জন্য ■ অমর কুমার দাস

একটু আলোর জন্য
ভালোবাসি কবিতা তোমায়
একটু ভাবিয়ে দিতে
বারবার ছুটে যেতে হয়
একটু কথা বলতে
কতোদিন অপেক্ষায় থাকি
একটু একটু অনেক কতক আশায়
বড্ড বাঁচতে ইচ্ছে করে

তোমায় মনে রেখে
এখনো পথ চলি

অণু কবিতা ■ তুমি সুন্দর

তোমার আচরণেই তুমি সুন্দর।

অণু কবিতা/লাশঘর ■ সন্তোষ সরকার

না মরেও লাশঘরে, শবের মিছিল

ইচ্ছে করে না ■ সত্যেন্দ্রনাথ পাইন

ইচ্ছা করে না তবু সম্মতি
কিছুটা ত্রিকোণে কিছুটা মিনতি

বেদনায় দুর্দান্ত রূপকথা
রাজজোটক কাতরতা নাকি মগ্নতা

আলো আশ্বাসের জীবন যাপন
প্রথমে রূপে, পরে অনুমোদন

অরিণ-তোমাকে ■ রিয়া

তোমার জন্য একটা ভালোবাসার কবিতা লিখব অরিণ....
একফালি আকাশ হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে বেড়াবে তাতে,
গোলাপী রোদ্দুরে বকেরা শুকোতে দেবে নির্দাগ সাদাটে পালক
আঢাকা বাতাসে ভেসে বেড়াবে বুনো মহুয়ার গন্ধ;
তোমার বুকের তিলে লেগে থাকা ভালোবাসার মিঠে আতর হয়ে।

কুয়াশার চাদরের ফাঁক দিয়ে যখন রামধনু দেখা যায়...
মেঘলা দিনে কেকার নূপুরে বৃষ্টি নামায় আশ্লেষী,
কুড়মুড়ে দুপুরেরা স্মৃতিজলসা বসায় ফেরিওয়ালার হাঁকে
অদেখা সময়ের বাঁকে লেগে থাকে হাজারো কল্পতরুর মূর্চ্ছনা
বলো অরিণ; এভাবে কি তোমায় কখনো কবিতায় ছুঁতে পারব না!

অণু কবিতা ■ মোক্ষ

নির্দয়ী শব্দেরা অন্ধকার রাত্রে ডাইরির পাতায় শিকার খুঁজে বেড়ায় মোক্ষানুসন্ধানে।

বন্দিনী ■ শম্পা চট্টোপাধ্যায়

জানলার কাচে তোমার অপেক্ষার দাগ,
লেগে আছে আজও অক্ষরহীন উচ্চারণে।
একরাশ ধুলো অবসাদের, জিজ্ঞাসার অধিক-
ঠিক কতখানি মেঘ জমলে বৃষ্টি নামতে পারে?
সেকথা লেখা আছে ওই আকাশের ঘরে।
মেঘের কাছে সুর পাঠালাম,
অফুরান রাগ মল্লার, সরদে অভিমানী ঝংকার,
নিরালাকে মনে হয় আপনার জন।
বন্দি ইচ্ছে বহু বিবর্ণ খামে,
স্বপ্নেরা যারা হয়নি বাস্তবে প্রতিফলন।

অণু কবিতা ■ আকুল কুলে

চরাচরহীন স্তব্ধ জলে দোয়াত বিহীন তরঙ্গে অক্ষরহীন উচ্চারণ।

ষড় রিপু ■ দীপশংকর সাঁতরা

এসেছি যখন যেতে হবে
যতই করো মানা
মধ্যে শুধু হাসি কান্না
ষড় রিপুর হানা।

এই হানাতে কাবু আমরা
কেবল ঘুরে মরা
সুখের আশায় সবাই ছুটি
যায় না তারে ধরা।

ঈশ্বর ■ কিশলয় গুপ্ত

তোমাকেই ঈশ্বর মেনেছি—তাই
সিন্দুকে লুকানো শব পোড়া ছাই
জমিয়ে রাখছি দু'হাতে।
কোনো দিন দেখা হলে তোমার সাথে
চুকিয়ে দেব যত ছিল ঋণ।

বলতে পারো— আর কত দিন
কত রাত হেলায় পার করে
মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবে শিয়রে?
আজও গুনগুনাই তোমারই গান
কিসের এত অভিমান?

অণু কবিতা ■ ধর্ম

ধর্ম মানে হাজারটা সুর একটা গান

ঋতুরঙ্গ ■ লক্ষ্মীকান্ত সিং

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে যেন সব পুড়ে হবে ছাই
বর্ষারাণীর আগমনে পুলকিত গ্রামের গরিব কৃষক ভাই

শরতের সাদা মেঘে কাশের ফুলে মা দুর্গার শুভ আগমন
হেমন্তে নবান্নে আনন্দে মেতে ওঠে, বঙ্গবাসীর সরল মন

শীতের ফুলে শীতের ফলে ভীষণ মুখরিত হয় প্রাণ
বসন্তের কোকিল আপন মনে গাহে সুমধুর গান।

শষ্য শ্যামলা হয়েছে মোদের, এই সোনার বঙ্গ
লাগে অতি চমৎকার, সুখ দুঃখের বিচিত্র ঋতু রঙ্গ

অণু কবিতা ■ ভালো লেগেছিল

প্রথম ভালো লেগেছিল যারে রেখেছি তাকে অন্তরে।

অণু কবিতা ■ নোবেল ■ শঙ্কর ঘোষ

নোবেল কবির নোবেল চুরি কেমন করে সহ!

গোধুলিয়া ■ দেবাশীষ অধিকারী

দিনের কঠিন সময় ধরিত্রির বুকে মিশে গেলে,
ফিরে আসে উদাসী বাতাস।
ফিরে আসে বনবাসী স্মৃতিরা।
আচমকা কম্পনে দুলে ওঠে অস্থিমজ্জার শরীর।
ক্ষণেক বন্দী হয় তোমার হৃদয়ে।
বিষাক্ত হয় রক্ত নীল বিষের রোষানলে।
লাজুক চাঁদ তখন আলতো হাসে; গোধুলির শেষ আকাশে।
পরিযায়ী পাখীরা ফিরে আসে;
স্ব-যত্নে পালন করা আপন আশ্রয়ে।

ছিলো ■ শৈবাল মজুমদার

ক্রোধ ছিলো স্নায়ুতে শোণিতে
প্রেম ছিলো যৌনগন্ধময় ফুলের মতন
ঘৃণা ছিল আমূল প্রোথিত
আশা ছিলো রক্তগন্ধময় নদীর প্লাবন

সাধ ছিলো আকাশচুম্বিত
দ্বিধা ছিলো হাঁটু বুকময়

যৌবন শুয়ে ছিলো ফুটপাত জুড়ে
যুবতীর বুকে শুধু অভিশাপ ধ্বনিত ছিলো
ভিখারীর মরা চোখে মরা শোক ছিলো তবু
প্রাণ ছিলো প্রাণজুড়ে একদিন ভোরে

মুখোশ ■ নাসির ওয়াদেন

সুখ-দুঃখের বলয় থেকে সূর্য ওঠে...

মৃত্যু উপত্যকা রাত্রির চাইতে ভীষণ ভয়ংকর
খিদে প্রতিটি পৃথিবীর কাছে বড়ো হুঙ্কার

আকাশ ক্রমশ শীতল হয়ে যায়
পাখি গান গেয়ে বিষাদ ভুলায়
প্রতীচী প্রাচ্যে তবুও বিসম লড়াই চলছে

কেউ কেউ মানবতার মুখোশ পরে ঘোরে
একটা মুখোশের আড়ালে এক এক পুঁজি

সুখ দুঃখের ভেতরে অন্য পৃথিবীর ছায়া দেখছি
আগামী বর্ষপঞ্জীর বর্ণময় মুখে—

অণু কবিতা ■ স্রোত

জীবন ছোটো বলেই কান্নার স্রোত দীর্ঘস্থায়ী

অণু কবিতা/কথায় কথায় ■ পার্থপ্রতীম সামন্ত

অবহেলাতে ভরে ব্যথায়, কথায় মরে কথায় কথায়

তুমি ও নদী ■ সঞ্জিত কুমার দুবে

তোমায় প্রথম দেখা
ভোরের শিশির ভেজা স্থলপদ্ম,
আমার কথা শুনে হাসিতে
একরাশ মুক্তো ঝরে পড়া,
তোমার চপল পায়ে নূপুর
বৃষ্টির রিমঝিম,
আমার হাতে তোমার হাত
চাঁপা ফুলের মূর্চ্ছনা,
একদিন বৃষ্টির জলে ভিজে
নদী হয়ে গেলে তুমি।

অণু কবিতা ■ পরিণতি

প্রণয়ের হৃদয় পোড়ে শ্মশানের কাঠ হয়ে।

ফুল ফোটে ■ ইন্দ্রানী দত্ত

বারুদের গন্ধে শহর ঢাকে
স্বজন হারানোর ব্যথা আঘাত হানে
তবু আজও ফুল ফোটে
শিশু হাসে মাতৃ ক্রোড়ে।

জীবনকে ভালোবাসা ■ চিন্ময়ী মিত্র দাস চাকলাদার

ব্যাকুলতার আকাশে
এখনো বাঁচার আশায়
আজন্মকাল ভালোবাসার
সমুদ্রে স্নান করা।
ভালোবাসার জন্য হাজারোবার
মরে বেঁচে থাকা
তবু জীবনের জন্য জীবনকে ভালোবাসা
জীবনকে জীবনের জন্য চাওয়া
জীবনকে জীবনের জন্য পাওয়া—
জীবনকে জীবনের জন্য ভালোবাসা।

গীতবিতান ■ ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী

বৈশাখে ঐ আসছে আবার নতুন ভোর
নতুন রবি নতুন আলোয় স্বপ্ন ডোর।
নতুন ফসল সোনার ধানে যায় ভরে
কাব্য গানে মনে আমার তুফান তোলে
রবির আলোয় গীতবিতান গেয়ে উঠি
পুরোনো যত ঝরা বিষাদ ঝেড়ে ফেলি
নতুন পাতায় নতুন কবিতা জেগে ওঠে
নতুন গানে বছর আমার সেজে ওঠে
হৃদয় রবির প্রাণের কথার ফুল ফোটে
কাব্য সাহিত্যে অনন্ত প্রেমের লেখা লেখে।

অসম্ভব ■ সন্ধ্যা ধাড়া

সবচেয়ে উন্নত শহরের বুকে
শতাধিক তল নিয়ে তৈরি দুটি বাড়ি
মাটি থেকে আকাশ ছোঁওয়া,
চৌকো গড়ন যেন ইলেভেন-ইংরাজি অক্ষর
একদিন—
দুটি যাত্রী বোঝাই বিমান কারা যেন অপহরণ করে
পৃথিবী বিখ্যাত বাড়ির গলার কাছে ঢুকে গেল

কয়েক মুহূর্ত পর পুরো বাড়ি দু'টি
বসে পড়ল মাটিতে। নিজের ভিতে।

ছবিটি বারবার দেখার ভাবার।

অণু কবিতা ■ মগজ ধোলাই

মগজধোলাই নিজেরও করা যায়, অপরেরও করা হয়।

আর্ট গ্যালারী ■ আব্দুল্লাহ আল রিপন

একটি হাতে ধরা
শান দেওয়া একখানা ছুরি
হাঁ-চাতকীর
গাল ভরা হৃদয়ের কাছাকাছি

একটি পোস্টারে
দারুন এক মুভি।

অণু কবিতা ■ নিহত নক্ষত্র

একটি মুখের উজ্জ্বল অনুপস্থিতি খুলে দিল আঁধারের মুখের নেকাব।

পরিণতি ■ ফখরুল আলম

আজন্মকাল রঙিন ঝালরে আবৃত শূন্যতার আশে
শামুকের মতো দাসত্বের খোলসে আপনারে ভুলে
চলেছে যে জন নির্বাসিত করে হৃদয়ের স্পন্দন!
সে তো জানেনা, এ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে অবিশ্বাস জমা হলে,
বাইবেলের কালো অক্ষরগুলো পাখির মতো সরিষার দানা মুখে
উড়ে যায়, দক্ষিণের আকাশে অন্ধকার নেমে এলে,
জমাট স্মৃতিরা ঝরে যায় ত্রিবেণীর ঘাটে। সময়ের অসীমতায়।
সে তো জানে না এখানে একবিন্দু হাহাকার জড়ো হলে,
বসন্তে ঝরাপাতা কিংবা উল্কাপিণ্ডের মতো
একদিন খসে পড়ে সকলে!

অণু কবিতা ■ সত্য

তুমি ভেবে, প্রতি বর্ষায় মৃত্যুকে পান করি আমি।

একুশে ফেব্রুয়ারি ■ দীপা ভৌমিক

অমর একুশ ডাকছে আমায়
ভরা মুকুলের গানে,
অমর একুশে শেখায় আবার
আঁধার জীবনের মানে।
একুশে দিয়েছে পলাশ শিমুল
কৃষ্ণচূড়ার লাল,
একুশে হলো শহীদ ভায়ের
রক্তে রাঙানো কাল।

ভাষা বাঁচাবার দীক্ষামন্ত্র শহীদ রক্তে লেখা,
মাথা উঁচু করে বাঁচারমন্ত্র সে ভায়ের কাছে শেখা।

অণু কবিতা ■ মেঘ কন্যা

আকাশ হয়ে যাবো মিশে, আয় না এমন বাদল দিনে।

শুকনো সেই নদী ■ সুদীপা সাহা

এতটাই শুকিয়ে গেছে নদীটি
পাথর ফেলে রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে
তার ওপর দিয়ে
এই রাস্তায় যদি সাইকেলে যান আপনি কোনো দিন
ঠিক সেই জায়গায় ভেঙে যাবে
সাইকেলের প্যাডেলটি
নদীতে যে জায়গায় ছিলো
সবচেয়ে বেশি মাছ
মরা এই নদী আজও রাস্তার বুকের ওপরে
ছুঁড়ে দেয় কত রকমের শাঁখ।

সৌহার্দের বার্তা ■ অঞ্জনা দাস

সম্প্রীতি সৌহার্দ বজায় রেখে চলো
হৃদ্যতা আন্তরিকতা যেটাই তুমি বলো।
স্বদেশে বিদেশে যেখানে তুমি যাও
শিক্ষা ও ব্যবহারে পরিচয় করে নাও।
সৌহার্দ সম্প্রীতির দৃঢ় বন্ধনে
জগৎ জাগবে নুতন চেতনে
মায়ের মুখের হাসি মুছে দিতে
জঙ্গি আসবে না বীর সেনার প্রাণ নিতে।
দেশে বিদেশে শুধু থাকবে শান্তি
হবে না মৌন মিছিল, মনে শুধুই প্রশান্তি।

জননী আমার ■ মায়ারানী সাহা

জননী আমার হৃদয় আসনে
বসিয়েছি তোমারে
পুজিব জননী সারাটি জীবন
তোমারেই বারে বারে।
মনে পড়ে আজ অতীতের কথা
লাগে কত ব্যথা মনে
শত অপরাধ ক্ষমা করো মাগো
অবোধ সন্তানে।
দিওগো আশিষ বাণী
চরণে রাখিব আমার হৃদয়খানি।

স্বচ্ছতা ■ বিজয় কুমার মাল

বসে আছি কুকর্মের রাজপ্রাসাদে
জ্বেলে রাখি অনেক আলোর সারি
জীবনের প্রান্তে এসে শেষ সূর্যাস্তে
মনের ভিতর সঞ্চিত ধুলো ঝাড়ি....

পাথরকুচি ■ রেবা মুখার্জী

পাথরকুচি পাথরকুচি
পাথরে নও গড়া!

সবুজ মোটা মোটা পাতা
তারই মাঝে ফুটে ওঠে
লাল লাল থোকা মাথা।
তোমার বুকে লুকিয়ে রাখো
গোপন সবুজ কথা
ব্যথিত হৃদয়ে বসন্তে তুমি
মেলে দাও শত পাখা।

ভোজন বাড়ির ছড়া ■ ডাঃ সুমীর কুমার বেতাল

ভাজা কচুরী হাতে গরম, আলুর দম দারুণ নরম।
ফিস্ ফ্রাইতে মন ভরে, সেলাড্ খেলে হজম করে।
ফ্রায়েড রাইস বুঝে খাবেন, মটনকারী সাথে পাবেন
মিক্সড চাটনি চেয়ে খাবেন, গরম পাঁপড় সাথে নেবেন।
করবেন নাকো হল্লাগোল্লা এবার সন্দেশ রসগোল্লা!
নিজের শরীর বুঝে নিন, এবার আসছে আইসক্রিম!
হাত ধোবার গরম জল, না পেলে ধরুন কল।
পানমশলা ভীষণ ভালো, মোড়ক খুলে মুখে ফেলো,
সাথে আছে দাঁতন কাঠি, বিদায় নিয়ে এবার হাঁটি।
ছোট-বড় এক রত্তি সবাইকে জানাই শুভ রাত্রি!

প্রেম ■ অলোক শ্রীমানী

প্রেম থেকে মুক্তি দাও 'আমাকে'
হে পৃথিবী উদ্যত যৌবন জ্বালা
উপবাস করুক, এ জন্মের মত সব
ভালোবাসা-বাসি একাকী নিরালা

মন্থর মুহূর্তগুলো যাক্ মরে যন্ত্রণায়
বসন্ত বাজি রেখে ফিরে যাক নিরুপায়
পাহাড়িয়া মাদলের ঢেউ, না পড়ে আছড়ে
ঝুমুর গানে আর বাঁশির সুরের নেশায়।

কবিতার জন্য ■ অমৃতা বিশ্বাস সরকার

বাংলা কবিতার পিঠ ঠেকে গেছে দেওয়ালে—কথাটি মাঝে মাঝেই কোনো না কোনো বিদ্যাবাগীশের মুখে শোনা যায়। তাছাড়া আছেই তো—"কবিতার বই আজকাল চলে না কিংবা কজন পড়ে বলুন তো।" এসব কথা আমার কাছে নিতান্তই হাস্যকর ও নিতান্তই প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই না। কথাটির ভিত্তিহীনতা প্রমাণহেতু আলোকপাত করতে হয় বাংলা কবিতার গৌরবময় ইতিবৃত্তের ওপর যা তিনটি যুগে বিভক্ত—ইতিহাস, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ।

বাংলা কবিতার উৎপত্তি হয়েছিলো প্রাকৃত ও পালি সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি থেকে। চর্যাপদ হলো বাংলা কাব্যের প্রথম নিদর্শন। সেই হিসেবে চর্যাপদের পদকর্তা লুইপা হলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি। মধ্যযুগের কাব্যধারাকে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা কবি বিজয় গুপ্ত, মাধব আচার্য, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী; বৈষ্ণব পদাবলী ধারার কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস এবং মহান অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস, শ্রীকরনন্দী, অদ্ভুতাচার্য, ভবানী প্রসাদ দাস এবং মহান অনুবাদক কৃত্তিবাস ওঝা প্রমুখ। বাংলা কবিতার আধুনিক যুগ হিসাবে ধরা হয় আনুমানিক ১৮০০ সাল থেকে বর্তমান তথা চলমান সময়কালকে। বাংলা কবিতার মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে যিনি সেতুবন্ধ রচনা করেছেন, তিনি হলেন ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পয়ার মাত্রা ভেঙে প্রবেশ করেন মুক্ত ছন্দে এবং লাভ করেন আধুনিক বাংলা কবিতার জনকের খ্যাতি। তারপর একে একে বাংলা কবিতার আকাশ ছেয়ে যায় বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোকে যাঁদের দীপ্তি আজও অম্লান।

যে বাংলা কবিতার অতীতের বুনিয়াদ এতো মজবুত আর বর্তমান এতো সমৃদ্ধ, সেই বাংলা কবিতার অস্তিত্ব সংকটাপন্ন এমন ভাবা আকাশ-কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয় বলে আমি মনে করি। যতদিন অনুভব শক্তি জেগে থাকবে ততোদিন বাংলা কবিতা জন্মাবে হৃদয়ে। আসলে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে আমাদের বিবেকের আমাদের বোধ শক্তির। বেশিরভাগ লোকেরই মেরুদণ্ড আজ সোজা নেই। অনেকেই মনের ভাব কলমের আঁচড়ে ঠিকঠিক প্রকাশ করলেও লোকসম্মুখে প্রকাশে ভয় পায়। কারণটা অজানা নয়— স্পষ্ট কথায় কষ্ট বেশি। কেউ কেউ দুঃসাহসী হয়ে সেই কষ্টের ভাগ কাঁধে তুলে নিলেও শেষে দশচক্রে ভগবান ভূত হয়। সেও গা ভাসায় চলমান স্রোতে। এমনিতেই কবিত্ব ফলানো হলো কিছুজনের কাছে অকর্মন্যদের সময় কাটানোর সুলভ পন্থা। তারপর মাঝে মধ্যে প্রাণবায়ুর অভাব হলে কবির সত্ত্বাই ধূলিস্যাৎ হওয়ার জোগাড় হয়। তবে যা-ই হোক না কেন বাংলা কবিতার আয়ু অতো ঠুনকো নয় যে সে কোনো অজানা প্রভাবের বশবর্তী হয়ে গুটিশুটি দিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সার্বিক দায়বদ্ধতা অস্বীকার করবে। উল্টে ভবিষ্যতেও বাংলা কবিতা বাংলা সংস্কৃতির ধারাকে স্বমহিমায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটি সুচারুভাবে পালন করবে।

বাংলা গানে বিমূর্ততা ■ পবিত্র চক্রবর্তী

যে সকল গানের বাণী অংশ বাংলা ভাষায় রচিত, সেসকল গানের সাধারণ নাম 'বাংলা গান'। এই সংজ্ঞার সূত্রে বাংলা গান নানাভাবে আদিকাল থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারায় বিকশিত হয়েছে। এমন কোনো নৃগোষ্ঠী নেই যাদের ভাষা এবং গান নেই। উভয়ই যোগাযোগের মাধ্যম। উভয়ই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অংশ। সুরের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা আছে, ভাষার তো আছেই। তবে মাধ্যম ভিন্ন, প্রকৃতিও ভিন্ন। ভাষার সাথে সঙ্গীতের (গীত-বাদ্য-নৃত্য) সম্পর্ক সহোদরার মতো। নিত্য দিনের বাস্তব জীবনের কাজকর্মের ভিতরে যে কথোপকথন বা বর্ণনা শুনতে পাই বা পাঠ করে অনুভব করি, তার ভিতরে রয়েছে মনোজগতের বাস্তব দশা। আর সেই বাস্তব দশাই যখন কল্পনার আশ্রয়ে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদিতে উপস্থাপন করা হয়, তখন তা হয়ে যায় মনোজগতের কল্প-বাস্তব নামক দ্বিতীয় স্তরের বিষয়। সুকুমার শিল্পকলায়, বাস্তব জীবনের বিভিন্ন বাস্তব দশাকে উপস্থাপন করা হয় নান্দনিক উপস্থাপনায়।

যদি বাংলা গানের ভাষার সন্ধান করতে যাই, তাহলে অবশ্যই ৩টি ভাষাকে জানতে বা উপলব্ধি করতে হবে। এই ভাষা তিনটি হল বাণী, সুর ও ছন্দ। এ ক্ষেত্রে বাণীপ্রধান গানে, গানের অর্থ জানাটা আবশ্যক, কিন্তু না জানলেও গানের আনন্দ নষ্ট হয়ে যায় না। মূলত এক্ষেত্রে গানের আনন্দটা প্রবহমান ধারায় সঞ্চারিত হয় সুর ও ছন্দের যাদুতে। গানে সুর ও ছন্দের প্রকৃতি না বুঝেই অধিকাংশ মানুষ গান শোনে, এমন কি গেয়েও থাকে। তাতে গানের জাত যায় না। কিন্তু জাতেও উঠে না। জাত শিল্পী হতে গেলে, গানকে সকল অর্থে আত্মস্থ করতে হয়। জাত শ্রোতা হতে গেলেও তাই। তাই জাত শিল্পীর পরিবেশিত গান, জাত শ্রোতার মাধ্যমে জাতের গান হয়ে উঠে।

সঙ্গীতের পরিচয় :

সঙ্গীত যদি গীত, বাদ্য, নৃত্য হয়। তাহলে অনুভবের মৌলিক ক্ষেত্রের বিচারে সঙ্গীত প্রথমেই দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এর একটি হলো শ্রবণের। এই ধারায় পড়ে গীত ও বাদ্য। দ্বিতীয় ধারাটি হলো দর্শনের। এই ধারায় পড়ে থাকে নৃত্য। নিশ্চয় একথা মানতেই হয় যে, সঙ্গীতের এই দুই ধারায় যে নান্দনিক অনুভূতির জন্ম দেয়, তা দর্শন এবং শ্রবণের সমন্বয়ে পূর্ণতা লাভ করে। বেতারযন্ত্রে এবং রেকর্ডে গান শোনার আগে গীত ও বাদ্য শ্রবণ ও দর্শনের বিষয় ছিল। কিন্তু দর্শন না করেও গীত-বাদ্য শ্রবণ করা যায়। এই কারণে গীত-বাদ্যের মৌলিক মাধ্যম হলো শ্রবণ— যোগাযোগ। এই বিচারে গীতবাদ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণের মৌলিক ধাপগুলো হলো—

সত্তা (entity) : মানুষ যত ধরনের বিষয়বস্তুকে পৃথকভাবে শনাক্ত করতে পারে, তা এক বা একাধিক শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে। এই প্রকাশযোগ্য শব্দ বা শব্দসমূহের সাধারণ পরিচিত 'নাম'। আবার 'নাম' রয়েছে যে কোনো বিষয়বস্তুকে পদপ্রকরণের বিচার 'বিশেষ্য' হিসাবে বিবেচনাা করা হয়।

বিমূর্ত সত্তা (abstract entity) : মানুষ এমন কিছু বিষয় অনুভব করে, যেগুলো কোনো বস্তু নয়। যে সত্তাগুলোর ওজন নেই, দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, বস্তু জগতে যাকে কোনো জায়গা ছেড়ে দিতে হয় না। এই জাতীয় বিষয়ের বস্তুগত আকার নেই বলেই এদেরকে বিমূর্ত বলা হয়েছে।

যোগাযোগ (communication) : যে কোনো প্রক্রিয়া বা মাধ্যমের দ্বারা পরস্পরের ভিতরে সংযোগ তৈরি করা।

শ্রবণ যোগাযোগ (auditory communication) : যে যোগাযোগ ঘটে ধ্বনি এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে।

বর্তমান আলোচনাার প্রধান বিষয় হল সঙ্গীত বিমূর্ত বা Abstract music। সাধারণ সঙ্গীত বা absolute music হল যে সঙ্গীত কেবলমাত্র শিল্পী তাঁর কণ্ঠে ভাষায় ফুটিয়ে তোলেন অর্থাৎ এই ধরনের সঙ্গীতের সাহায্য নিয়ে কোনো নৃত্য বা আলেখ্য হয় না। শিল্পীর কণ্ঠস্বর এবং শ্রোতা সরাসরি যুক্ত থাকে। মূলত এই ধরনের বিমূর্ততা সম্পর্কে সম্যক ধারণার সৃষ্টি হয় আনুমানিক আঠেরো শতকে জার্মান রোমান্টিসিজম নিয়ে লেখা কাব্যগাথায়। যেমন—উইলিয়াম হেনরিচ, লুড উয়িকটিকের প্রমুখের লেখায়। তবে ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে রিচার্ড ওয়াগনার, বিথভেন প্রমুখ absolute music শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য হল কোন কোন সমালোচক Absolute music বা সাধারণ সঙ্গীত এবং Abstract music বা বিমূর্ত সঙ্গীতকে অনেকাংশে এক দেখেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে গীত আর সঙ্গীত সমার্থক নয়। গীত যেন সংগীতের অধীন একটা বিষয়। কিন্তু একদিন তারা একার্থক ছিল। কালক্রমে গীত যেখানে ছিল সেখানেই থেকে গেছে। আর সঙ্গীত শব্দটির অর্থবিস্তৃতি ঘটেছে। এ রকম ঘটা অভূতপূর্ব, অসাধারণ বা অযৌক্তিক কিছু নয়। বরং এর প্রয়োজন আছে। কিন্ত এক্ষেত্রে অর্থ-বিস্তৃতির মূলে কাজ করেছে দুটি বিষয়। সহজ ভাষায় দাঁড়ায়, গীত কেবলমাত্র শিল্পীর কণ্ঠস্বর থেকে নির্গত হয় এবং সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশিত হয়ে থাকে।

অন্য মানিক ■ অভিনব বসু

সত্যজিৎ রায়ের ছবি তো সবাই দেখেছেন, বই পড়েছেন, আঁকাও দেখেছেন; আজ আসুন তাঁর অন্য আর একটা দিক উদ্ভাবন করি, যেটা নিয়ে খুব বেশী আলোচনা হয় না; রেকর্ড কালেক্টর সত্যজিৎ। যারা রেকর্ড শোনেন (এখনও), তাঁরা সবাই কিন্তু সংগ্রাহক নন, কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা সংগ্রাহক, আবার কিছু মানুষ আছেন যারা অত্যন্ত পুরান (extremely vintage) রেকর্ড সংগ্রাহক, কিছু মানুষ আছেন যারা রেকর্ড সংগ্রাহক শুধু হাইফাই (high fidelity) সাউন্ডের জন্য, আর কিছু কিছু সংগ্রাহক আছেন শুধুমাত্র সঙ্গীতের জন্য, সত্যজিৎ রায় ছিলেন এই শেষ ঘরানার মানুষ। শুধু সংগ্রাহক নন, তিনি কিন্তু এ নিয়ে পড়াশোনাও করতেন এবং নিজের ছবিতে কাজে লাগিয়েছেন এ শিক্ষা। তাঁর একটা ইন্টারভিউ (Pierre Andre Boutang-এর সাথে) তিনি উল্লেখ করেছেন সময়ের অভাবের জন্য কিভাবে তিনি ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল রেকর্ড উল্টো করে চালিয়ে অন্যরকম সঙ্গীত তৈরি করেছেন এবং কেউ সেটা ধরতেও পারেনি, উদাহরণ হিসাবে বলেছিলেন জলসাঘরের একটি দৃশ্যের কথা।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গীত প্রীতি জন্মায় ছোটোবেলায় হেমেন্দ্র মোহন বোসের' কাছে কলের গান শুনে বড় হতে হতে সেই ভালোবাসা বাঁক নেয় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের দিকে। সত্যজিৎ রায় প্রচুর পাশ্চাত্য সঙ্গীত শুনতেন এবং কালেক্টও করতেন, মানে সিরিয়াস সঙ্গীত, ক্লাসিক্যাল। তাঁর সংগ্রহে ছিল প্রচুর ৭৮ আর.পি.এম. রেকর্ড; রায় এবং তাঁর বন্ধু অনিল গুপ্ত মিলে সে সময় একটি গ্রামোফোন সোসাইটিও তৈরি করেন কলকাতায়।

এবার আসি এখনকার পাঠকদের জন্য একটু বিশ্লেষণে, ৭৮ আর.পি.এম হল সেই রেকর্ড যা কে চালাতে রেকর্ডটিকে ৭৮ আর.পি.এম. (Rotation Per Minute) এ ঘোরাতে হয়, R.P.M. যত বেশি স্পীড তত বেশি। এই রেকর্ডে মূলত শেল্যাক (Shellac) থেকে তৈরি এবং গ্রুভগুলি একটু মোটা হয়। ফলে এই রেকর্ডে এক পিঠে একটাই গান ধরে। অন্যদিকে এল.পি. (লংপ্লেয়িং) তৈরি হয় ভিনাইল/ভাইনল (Vinyl) থেকে এবং এর আর.পি.এম. হল ৩৩/১/৩; ফলে রেকর্ড সাইজ যদি একও হয় (এল.পি. যদিও ২ ইঞ্চি বড়) তবুও গ্রামোফোনের কাঁটাটির পুরো রেকর্ডে ট্রাভেল সারতে অনেক বেশি সময় লাগবে, ফলে এল.পি.তে বেশি গান ধরবে। এছাড়াও ছিল ছোট ৭" রেকর্ড এস.পি. (স্ট্যান্ডার্ড প্লে, এক পিঠে একটি গান) এবং ই.পি (এক্সটেন্ডেড প্লে, এক পিঠে দুটি গান), দুটিই ৪৫ আর.পি.এম.। এম.পি. এবং ই.পি. অনেক পরে এসেছে আগে ৭৮ই স্ট্যান্ডার্ড ছিল। পরে বাজারে আসে সুপার সেভেন (৭", ৩৩ ১/৩) দুই পিঠ মিলিয়ে সাধারণত ৪ বা তার অধিক গান থাকত।

যাইহোক এল.পি. যখন প্রথম প্রথম আসে তখন সত্যজিৎবাবুর এক মজার অভিজ্ঞতা হয়; যেহেতু তাঁর ৭৮ শুনে অভ্যাস, এবং সেখানে এক পিঠে একটাই গান থাকত, ফলে এল.পি. চালিয়েও একটা গান শেষ হতেই তিনি ভুলক্রমে উঠে রেকর্ড উল্টাতে যেতেন, পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই পরের গান চালু হয়ে যেত, তিনি আবার ফিরে আসতেন নিজের জায়গায়। সেই জন্যই হয়তো তিনি এল.পি.র যুগেও ৭৮ বেশি

কিনতেন বা শুনতেন। তাঁর কাছে একটি Pye Black Box Record Player ছিল, জানিনা সেটা এখনও আছে কিনা বা থাকলেও কি অবস্থায় আছে। হাই ফাই শব্দটায় তাঁর খুব একটা আগ্রহ ছিলো না, তিনি ছিলেন শুধুই একজন সঙ্গীত রসাগ্রাহী।

তিনি যে শুধু শুনতেন তা নয়, তাঁর ঘরের ছবি সবাই দেখেছেন এবং জানেন যে তিনি সব বিষয়ে রীতিমতো পড়াশুনা করতেন, পাশ্চাত্য সঙ্গীত নিয়েও তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনা ছিল। তাঁর লাইব্রেরীতে Tovey-র লেখা প্রায় সব বইই ছিল, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য "Essay in music criticism', এবং খুব দুর্লভ বই "A musician talks the integrity of music" এছাড়া তাঁর লাইব্রেরীতে ছিল "Orchestration" by Cecil Forsyth, "Biography Of Beethoven" by Alexander Wheelock Thayer (বেঠোভেনের প্রথম স্বীকৃত জীবনী) ইত্যাদি বই।

মিঃ রায়ের মতে পৃথিবীতে দুই ধরনের সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, "even" এবং "odd"। ইভেন হলেন তাঁরা যারা বেঠোভেনের দুই, চার, ছয়, আট নম্বর সিম্ফনি পছন্দ করেন, আর অড যারা তিন, পাঁচ, সাত, নয় সিম্ফনি পছন্দ করেন, রায় নিজে ছিলেন ইভেন। তিনি নিজে পশ্চিমী সঙ্গীতের মধ্যে বেঠোভেন এবং মোৎসার্ট বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। এঁদের উপরে তিনি দুটি রেডিও ভাষ্যও দিয়েছিলেন, যথাক্রমে ১৯৭০ এবং ৯১ সালে। শেষ ভাষ্যটি যখন রেকর্ড করা হয়েছিল তখন তিনি খুবই অসুস্থ, তবুও শ্রোতাদের জন্য তিনি মোৎসার্টের ম্যাজিকফ্লুটের কিছু অংশ বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন। তাঁর ছবির সঙ্গীতেও এর প্রভাবে দেখা গেছে, জলসাঘরের কথা আগেই বলেছি, "শাখা প্রশাখা" তে বাখ ও বেটোভেনের ব্যবহার হয়েছে, "গুপীগাইন বাঘাবাইনে" দেখা গেছে ম্যাজিকফ্লুটের প্রভাব, "ঘরে বাইরে" ছবিতে যে ফিউনেরাল মার্চ আছে সেখানে রিচার্ডওয়েগ্নারের, গোতেদেমারুং (Gotterdammerung) এর আভাস স্পষ্ট।

ফিল্ম মিউজিকের মধ্যে (OST) তাঁর পছন্দ ছিল সারগেইপ্রোকোফিয়েড (Sergei Prokofiev)। প্রোকোফিয়েভের, ইভানদ্যাটেরিবল অ্যালাবমটি এতবার শুনেছিলেন যে সেটির কভারটি ছিঁড়েই গেছিল একেবারে, আবার বাধাঁতে হয়েছিল। সম্ভবত গেটফোল্ডকভার বা স্পেশাল এডিশন ছিল। তিনি খুব চেম্বার মিউজিক শুনতেন, তাঁর মতে পশ্চিমীক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের হীরে জহরত ছড়ান আছে চেম্বার মিউজিকে। তাঁর ক্যাসেট এবং রেকর্ড কালেকশনে প্রচুর দুর্লভ চেম্বার মিউজিক ছিল; যেমন মেন্ডেলশন ও সুমানের পিয়ানো ট্রায়ো, সুবারটের লেখা গান, বেঠোভোনের পিয়ানো ট্রায়ো, বকারিনির গীটার কুইন্টেট ইত্যাদি।

এছাড়াও তাঁর প্রিয় ছিল অপেরা এবং কোরাল মিউজিক। তাঁর কালেকশনে মোৎসার্টের সমস্ত অপেরাই ছিল। এছাড়া ছিল বেশ কিছু দুর্লভ অপেরার সংগ্রহ, যেমন Thamos, King of Egypt এবং La clemenza di Tito ইত্যাদি ছিল। তাঁর সংগ্রহের অনেক রেকর্ড সংগ্রহশালাতেও পাওয়া যায়না। তিনি নিয়মিত অপেরার উপর বই এবং ক্যাটালগও সংগ্রহ করতেন।

কোরাল সঙ্গীতের মধ্যে তাঁর প্রিয় ছিল Haydn's The Creation, Bach's St Mathew's Passion, Bethoven's Missa Solemnis ইত্যাদি। তাঁর সংগ্রহে অবশ্যই ছিল প্রচুর দুর্লভ কোরাল সঙ্গীতের রেকর্ড, যেমন—Missa Solemnis,

ভিয়েনা সিম্ফনিঅর্কেস্ট্রার সংযোজনায় কেলেম্পারের রেকর্ডিং। এছাড়াও তিন শুনতেন গ্রেগরিয়ানচান্ট।

সত্যজিৎবাবু পরবর্তী জীবনে এল.পি. ক্যাসেট ইত্যাদিও সংগ্রহ করেছেন। সংগ্রহ শুরু করেছিলেন সিডিও, কিছু সিডি ক্যাটালগ আনিয়েছিলেন। কিন্তু কালের নিষ্ঠুর আঘাতে সে সংগ্রহ তিনি আর শেষ যেতেন পারেননি।

তথ্যসূত্র :

রেকর্ড সংগ্রাহক সত্যজিৎ রায়, কিশোর চট্টোপাধ্যায়, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন পাবলিকেশন

Satyajit Ray on Music, Pierre-Andre Boutang.

[*] **হেমেন্দ্রমোহন বোস :** হেমেন্দ্র মোহন বোস ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের পিসতুতো দাদু। হেমেন্দ্রমোহন বোস ভারতবর্ষে প্রথম গ্রামোফোন কলের প্রস্তুতকর্তা। এছাড়া তাঁর আর এক সৃষ্টি ছিল কুন্তলীন তৈল। (হেমেন বোসের সুযোগ্য পুত্র নীতিন বোস ছিলেন স্বনামধন্য চিত্র পরিচালক এবং তাঁর পরিচালিত সিনেমায় (ভাগ্যচক্র, ১৯৩৫) সর্বপ্রথম প্লে ব্যাক সংগীতের ব্যবহার করা হয়।

গাজন ■ কার্তিক পাত্র

'আমরা দুটি ভাই শিবের গাজন গাই,
ঠাকুমা গেছে গয়া কাশি ডুগডুগি বাজাই।'

ছড়াটা শুনলেই গাজন, চড়ক, নীলপূজা, ধর্মঠাকুরের উৎসবের কথা মনে পড়ে যায়। বর্ণময় দৃশ্যগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সারা চৈত্র মাস জুড়ে গাজন উৎসব হয়। কোথাও কোথাও বৈশাখ মাসেও হয়। এছাড়া অন্য মাসেও বেশ কিছু জায়গাতে হয়ে থাকে গাজন। যেহেতু নিয়মিত মাসের বাইরে এই উৎসব তাই এই উৎসবকে 'হুজুকে' গাজন বলা হয়। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় এই উৎসব 'গম্ভীরা' নামে খ্যাত বিশেষত মালদহ জেলার গম্ভীরা আমাদের কাছে নামটা অতি সুপরিচিত।

গাজন শব্দটি সৃষ্টি কোথায়? গাজন শব্দটি এসেছে গর্জন শব্দ থেকে। অর্থাৎ অনেক সন্ন্যাসী একত্রে গর্জন করে ঈশ্বরের সাধনা করে বলেই এই উৎসবকে গাজন বলে। আবার অনেকের মতে 'গা' শব্দের অর্থ গ্রাম 'জন' শব্দের অর্থ জনগণ, অর্থাৎ গ্রামের জনগণের সমবেত সাধন উৎসবকে গাজন বলা হয়। গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু পূজা অর্চনাও হয়। যেমন—চড়ক পূজা, নীল পূজা, ধর্মঠাকুরের পূজা ইত্যাদি।

প্রথমে একটি লম্বা খুঁটি মাঠের মাঝে পোঁতা হয়। তার মাথায় ছিদ্র করে অন্য একটি বা দুটি খুঁটি আড়াআড়ি ভাবে দন্ডায়মান খুঁটির মাথায় গাঁথা হয়। অনেকটা দাঁড়িপাল্লার মত দেখতে লাগে। এই খুঁটি পূজা করা হয়। তারপর দু'প্রান্তে মানুষকে ঝুলিয়ে মাথায় একটি রশি বেঁধে নিচে থেকে ওই রশি টেনে জোরে ঘোরানো হয়। এই উৎসবকে চড়ক পূজা বলা হয়। শিব পার্বতির বিবাহউৎসবকে নীলপূজা বলা হয়। ভক্তরা পূজার সমাপ্তে দেবদেবীর মন্দিরে মোমবাতি, ধূপ-প্রদীপ প্রজ্বলিত করেন। ধর্ম পূজাও নীল পূজার মতন ধর্মরাজ ও দেবী মুক্তির বিবাহ অনুষ্ঠান। নীলপূজা মূলত চড়কের আগের দিন হয়। চড়ক সাধারণত চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিয়ে হয়। গাজন উৎসবকে কেন্দ্র করে অনেক সন্ন্যাসী একমাস ব্যাপী অনেক কৃচ্ছসাধন করেন। সারাদিন উপবাস থেকে দিনান্তে একবার মাত্র আহার করেন নিজে হাতে রান্না করে। জনশ্রুতি রয়েছে। দেবী পার্বতি রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যাবার পর শিবঠাকুর নিজে হাতে রান্না করে খেতেন। কোন সাধক সারা চৈত্র মাস মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা বৃত্তি করে জীবন ধারণ করেন। কথিত রয়েছে শিব একবার মাতা অন্নপূর্ণার নিকট ভিক্ষা চেয়ে জীবন ধারণ করেছিলেন। আবার কিছু মানুষ শিব-পার্বতি সেজে মানুষের নিকট ভিক্ষা করেন। এদের গাজন সঙ বলা হয়। চড়কের দিন অনেক সঙ একত্রে ভীড় করে চড়ক মাঠে। এদের দেখতে ভীড় করেন গ্রামের জনগণ। বেচা-কেনার দোকানদাররা পসরা সাজায়। ক্রমশ মেলা হয়ে ওঠে। চড়ক পূজা উপলক্ষ্যে এই মেলা হয় বলে একে চড়ক মেলা বলা হয়।

গাজন উপলক্ষ্যে অনেক ভয়ঙ্কর এবং কষ্টদায়ক খেলা হয়, যেমন— লাঠিখেলা, তলোয়ার খেলা, ছুরি খেলা, নিজস্ব শরীরে কাঁটা দিয়ে ফুল গেঁথে মালা তৈরি করা হয়।

বাঁশকে মাটিতে পুঁতে মই আকারে বেঁধে অনেক উচ্চস্থান থেকে ঝাঁপ দেওয়া হয়। একে দাঁড়ি ঝাঁপ বলা হয়। কয়েকটি বঁটিকে একটু কাতভাবে সাজিয়ে তার ওপরে ঝাঁপ দেওয়াকে বলা হয় বঁটি ঝাঁপ। ফল হাতে নিয়ে ঝাঁপ দেওয়াকে ফল ঝাঁপ বলা হয়। এসব অনুষ্ঠান শেষ হলে গভীর রাতে বিভিন্ন স্থানে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদের মধ্যে কালীকা পাতারি নৃত্য সর্ব বহুল প্রচলিত।

গ্রামীণ লৌকিকতা সব জেলার মত হাওড়া জেলাও বিশ্বাস করে। তেমন কয়েকটি নিজের চোখে দেখেছি যা এক কথায় অনির্বচনীয়। হাওড়ার নারনায় বিখ্যাত পঞ্চানন্দ ঠাকুর। ওখান থেকে একটু দূরে একটি অনুষ্ঠান হয়। নীলপূজার আগের দিন দুপুরে পঞ্চানন্দ মন্দিরের মূল সন্ন্যাসী ও পুরোহিত গিয়ে একটি বেদীসহ খেঁজুর গাছকে পূজা করেন। তারপর মূল সন্ন্যাসী ওই গাছের ওপর উঠে পড়েন। ডগার কয়েকটি পাতা ধরে বাকি পাতাগুলোকে খালি পা দিয়ে নেচে কাঁটা গুলিকে ভেঙে ফেলেন। যা কাকতালীয় মনে হলেও অত্যন্ত বিস্ময়কর। আবার শ্যামপুরের রতনপুর নামক জায়গায় দাঁড়ি ঝাঁপ বেশ বিখ্যাত। রতনপুর মন্দিরের পাশে একটি নারকেল গাছ রয়েছে। মন্দিরের সামনে সেই নারকেল গাছ সমান বাঁশ বাঁধা হয়। নীচে একটা বস্তাকে অবলম্বন হিসাবে, চারজন চারটি খুঁট ধরে থাকে। ওই উঁচু বাঁশ থেকে ঝাঁপ দেওয়া হয় বস্তাটার ওপর। যা সত্যিই ভয়ঙ্কর। উলুবেড়িয়ার কাটিলা নামক গ্রামে চড়কের দিন মানিকচুরি ও কাঁটা গোরেন উৎসব হয়। কলামোচার খোসা সহ বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে পূজা করা হয়। তারপর মূল সন্ন্যাসী ওগুলি চুরি করে নিয়ে যায়। বাকি সন্ন্যাসীরা তাকে ধরে ফেলে। তখন মূল সন্ন্যাসী তার হাতে থাকা বেত দিয়ে সজোরে মারতে থাকেন তবুও কোন সন্ন্যাসী কোমর ছেড়ে দেয় না। যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। এখানকার কাঁটা গোরেন অনুষ্ঠানটি ও অত্যন্ত কষ্টদায়ক। বড় বড় শেকুল কাঁটা গাছের ডাল দিয়ে মাটিতে বিছানা করা হয়। কেবলামাত্র এক পাট গামছা বিছিয়ে আদুল গায়ে সকল সন্ন্যাসী গড়াগড়ি খায় তার ওপর দিয়ে। উলুবেড়িয়ার কৈজুড়ী নামক গ্রামে হাকগুপড়া এক অনুষ্ঠান হয়। মূল সন্ন্যাসী পূজা চলাকালীন হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে যায়। বাকি সন্ন্যাসীরা অনেক কান্নাকাটি করলে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর জ্ঞান ফিরে আসে।

এইভাবেই উৎসব প্রিয় বাঙালির মননে-চিন্তনে, লৌকিকতায়-আত্মবিশ্বাসে চিরকাল জীবিত থাকবে গাজন উৎসব, চড়ক পূজা, নীলপূজা, ধর্মপূজার ব্রতকথা।

দান এক অতি মহৎ কর্ম। যে কোন ধর্মের ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে দানের মহিমাকীর্তন এবং একই সঙ্গে দানের বাধ্যবাধকতার অজস্র উল্লেখ বিভিন্ন ধর্মের সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে হিন্দুধর্মের গ্রন্থগুলিতেও বা মহাকাব্যে দানের মহিমাকীর্তন যথেষ্ট দেখা যায়। পৌরাণিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত দানের নানা বিচিত্র সুন্দর কাহিনী শাস্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস থেকে জানা যায়। দাতার মহত্ব অসাধারণ হলে তাঁকে দানবীর বলে আখ্যা দেওয়াও হয়ে থাকে।

দান শব্দটির ব্যাকরণগত তত্ত্বের জটিলতায় না গিয়ে সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে কোনোরকম বিনিময় বা প্রত্যাশা ছাড়াই দাতার নিজের সম্পূর্ণ অধিকার বা স্বত্ব চিরতরে ত্যাগ করে কোনো কিছু গ্রহীতাকে সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করাকেই দান আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু দান বলে প্রচলিত প্রক্রিয়াগুলি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে দাতা দানের বিনিময়ের বা প্রতিদানে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনো কিছু পাওয়ার আরোপিত বা অকথিত শর্ত হিসাবে দান করেন বা করেছেন। সবচেয়ে হাতের কাছে যে উদাহরণটি আছে সেটি হল অর্থ প্রদানের মাধ্যমে পূণ্যার্জন। ব্রাহ্মণকে, ধর্মস্থানে কোনো আশ্রমে বিশেষত ভিক্ষুককে অর্থ প্রদান করলে তাতে প্রভূত পূণ্যার্জন হয়, নরকগমন এড়ানো যায়, স্বর্গগমন সুনিশ্চিত করা যায়—এই ধারণাটি খুবই জনপ্রিয়। যাইহোক, এই কর্মগুলি হয়তো প্রশংসনীয় হতে পারে, কিন্তু এগুলি ঠিক দান নয়। কেবলমাত্র দানের উদ্দেশ্য নিয়ে শর্তহীনভাবে দান করা হলে, তবেই সেটিকে প্রকৃত দান বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

প্রকৃত দানের প্রসঙ্গ আলোচনায় আলোচ্য প্রবন্ধে আঙ্গিক হিসাবে মহাভারতে উল্লিখিত চারজনের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। দানবীর কর্ণ, দানবীর বলিরাজ, মহামুনি দধীচি এবং দানবীর রাজা উশীনর। এঁদের দানসংক্রান্ত ঘটনা প্রায় প্রত্যেকের জানা আছে। সেজন্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঘটনাগুলির খুঁটিনাটিসহ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন ভেবে তা করা হল না।

প্রথমে দানবীর কর্ণের কথা ধরা যাক। এই কানীন মহাবীরের প্রকৃত পিতা এঁকে অভেদ্য অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল দিয়েছিলেন যা তাঁর অঙ্গীভূত ছিল সেগুলির জন্য তিনি রণক্ষেত্রে অবধ্য ছিলেন। ওই দুটি জিনিস ইচ্ছামত তাঁর দেহ থেকে বিচ্যুত করা সম্ভব ছিল না। একদিন কর্ণের প্রাত্যহিক প্রাতঃস্নানের পর ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কর্ণের কাছে এসে ওই অভেদ্য সুরক্ষাবর্ম দান হিসাবে চেয়ে বসলেন। কারণ এটি সুবিদিত ছিল যে প্রাতঃস্নানের পর প্রার্থীকে মহাবীর কর্ণের অদেয় কিছু থাকে না।

ইতিমধ্যে কর্ণকে তাঁর পিতা মরীচিমালী পূর্বেই সবকিছু অবহিত করে কবচ-কুণ্ডল ইন্দ্রকে না দেবার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতার সতর্কবার্তা সত্ত্বেও কর্ণ তাঁর দানবীর অভিধার কোনরকম হানি ঘটাতে কিছুতেই রাজি হলেন না।

অগত্যা দেব ত্বিষামীশ কর্ণকে সংগুপ্ত এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ দিয়ে দিলেন।

অতএব সব জেনেশুনে নিজের দানবীর অভিধার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কর্ণ আপন শরীর কেটে কবচকুণ্ডল বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ইন্দ্রকে দান করেছিলেন। তবুও ঘটনাটি এইখানে শেষ হলে মোটামুটি ভালো হত। কিন্তু আপন পিতার পরামর্শ মতো এরপরই কর্ণ ইন্দ্রের কাছে মহাশক্তিশালী একঘ্নী অস্ত্র চেয়ে ফেললেন এবং তার পেয়েও গেলেন। অর্থাৎ কবচকুণ্ডল দিলেন, তবে বিনিময়ে তিনি একঘ্নী অস্ত্রটি লাভ করলেন। সব দিক বিবেচনা করলে প্রাগুরু চারজনের মধ্যে কর্ণকে চতুর্থস্থানের সম্মানে ভূষিত করা যায়।

এরপর দৈত্যসম্রাট বলি। আপন বীরত্বে তিনি দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করে স্বর্গরাজ্য অধিকার করেছিলেন। সেই আনন্দে বা বিজয় বিজয় উৎসবে আয়োজিত এক মহাযজ্ঞে মহাদানের আয়োজন করেছিলেন। দানপর্বের একেবারে শেষের দিকে সেখানে গুটিগুটি পায়ে হাজির হল এক নিতান্ত খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণবালক— প্রার্থী হয়ে। তাঁকে দেখেই সেখানে উপস্থিত দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সচকিত হলেন। বলিরাজ বালকটিকে চিনতে না পারলেও শুক্রাচার্য আপন প্রজ্ঞাবলে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন। তিনি শিষ্যকে সতর্ক করলেন, এই ব্রাহ্মণ বালক প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশী বিষ্ণু। দানগ্রহণের মাধ্যমে বলির সর্বনাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। একে যেন কোন কিছু দান না করা হয়। কিন্তু বলিরাজ তখন দানের অহংকারে উন্মত্ত ছিলেন। গুরুদেবের সতর্কবার্তায় সাবধান হওয়া দূরে থাক, আরো উন্মত্ত হলেন— স্ফীততর হলেন দানের অহংকারে। সেই বালকবেশীর প্রার্থনামত তাকে ত্রিপাদভূমি দান করতে গিয়ে তিনি সর্বস্ব হারালেন। নিজেও পাতালবন্দী হলেন। বিখ্যাত দান বটে কিন্তু দানের অহংকারলিপ্ত। তাই বলিরাজ তৃতীয় স্থানে সম্মান প্রাপক।

রাজা উশীনর। আপন বীরত্বে ইন্দ্রতুল্য। ইন্দ্রত্ব হারানোর আশঙ্কা নিয়ে উশীনরের মহত্ব পরিমাপ করতে এলেন ইন্দ্র ও অগ্নি, যথাক্রমে শ্যেন ও কপোতের ছদ্মবেশে। কপোত প্রাণভয়ে রাজার ক্রোড়ে আশ্রয় নেওয়ার চমৎকার অভিনয় করলো। শ্যেন পক্ষীও তার খাদ্য মাংসের দাবি করার অভিনয়ে কোনো ঘাটতি রাখলো না। উশীনর কিন্তু এসব কিছুই বুঝতে পারেননি। কর্ণ বা বলির মত ছদ্মবেশী দেবতাদের সম্বন্ধে কেউ তাঁকে সতর্ক করে দেয়নি। কপোতকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি শ্যেনপক্ষীর দাবি মতো কপোতের সম ওজনের নিজের দেহের মাংস কেটে দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত দেহটাই মাংস হিসেবে দান করে দিলেন। নিঃসন্দেহে আগের দুটি দানের তুলনায় অনেক মহত্তর দান। সম্পূর্ণ পরার্থে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন উশীনর। এই দানের বিনিময়ে উশীনর কিছুই প্রত্যাশা করেননি। তবে এই ঘটনার পরই তাঁর এই মহাদান প্রচেষ্টার পুরস্কার হিসাবে উশীনরকে মানবশরীরে দিব্যরথে চাপিয়ে চতুর ইন্দ্র তাঁকে স্বর্গরাজ্য দর্শন করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উশীনর সেই দুর্লভ পুরস্কার নিতে কোন আপত্তি করেননি। মহিমান্বিত এই দান অবশ্যই দ্বিতীয় স্থানে অধিষ্ঠিত হবে।

মহাবীর বৃত্রাসুরের ভয়ে দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্র তখন স্বর্গরাজ্য ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অবশ্য এইরকম অবস্থায় দেবতাদের এই নিতান্ত অযোগ্য ইন্দ্রিয়সেবী রাজাটিকে বার বার পড়তে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং মহেশ্বর এই তিন মহাপ্রধানের কারো না কারো কৃপায় স্বর্গরাজ্যে আবার গুটি গুটি ফিরে আসতে পেরেছেন। এইবারের স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়নের পর আবার সেখানে ফিরতে পারার এবারের সমাধান সূত্র হিসাবে জানা গেল যে, মহা মুণি দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্র ছাড়া আর কোনোভাবেই বৃত্রাসুরকে ধ্বংস করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সপার্ষদ ইন্দ্ররাজ ছুটলেন তপস্যাব্রতী মহামুনি দধীচির কাছে আকুল হয়ে। কতদিন ধরে তাঁরা স্বর্গীয় আসবের স্বাদ থেকে বঞ্চিত! অপ্সরাদের উল্লোল নৃত্যগীত কতদিন নিশ্চিন্তে উপভোগ করা হয়নি। স্বর্গরাজ্যের সেইসব নির্ভার বিলাসযাপন কতদিন ধরে বন্ধ রয়েছে! দেবতারা সমবেতভাবে যথেষ্ট কেঁদেকেটে শেষে বললেন কী প্রয়োজনে তাঁরা দধীচির কাছে এসেছেন তাঁরা বজ্র নির্মাণের জন্য দধীচির অস্থি চান অর্থাৎ সোজা কথায় দধীচির মৃত্যু চান। স্বর্গরাজ্য ফিরে পেতে বৃত্রাসুরের মৃত্যু চাই। তার জন্যই দধীচির মৃত্যু চাই।

আশ্চর্য! মহা আশ্চর্য! এই ভয়ঙ্কর, ভীষণভাবে স্বার্থবাহী, নির্মম মহাঅন্যায় প্রস্তাব শুনে দধীচির মুখে ফুটে উঠলো মৃত্যুঞ্জয়ী হাসির দ্যুতি। বললেন, আমার অস্থি কারো উপকারে লাগলে নিজেকে ধন্য মনে করবো। আমি এখনই ধ্যানযোগে মৃত্যুগ্রহণ করছি। এই বলে সেই মহাযোগী ধ্যানস্থ হয়ে তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করলেন।

তাঁর এই মহিমান্বিত স্বেচ্ছামহাপ্রয়াণে কোন প্রকার শোক বা সম্মান প্রকাশের পরিবর্তে নির্লজ্জ স্বার্থপর কাপুরুষ দেবতাদের দল উল্লাসে নৃত্য করতে করতে দধীচির অস্থি নিয়ে বিশ্বকর্মার কাছে চললেন যথাশীঘ্র বজ্র নির্মাণের ব্যবস্থা করতে। দানবীরের প্রথম আসনটি ধন্য করতে একমাত্র মহামুনি দধীচি ছাড়া আর কেউ যোগ্য হতে পারেন না।

অচল ■ অমিয় আদক

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের তিনটি বর্ণ সমাহারে সহজ অ-কার বিশিষ্ট শব্দের প্রথমটি 'অচল'। অচল শব্দটির অর্থ না জেনেই তখন কেবল শব্দ হিসাবে শিখেছি। বড় হয়ে জানলাম শব্দটির অর্থ পর্বত। আবার অচল অর্থে যা চলমান নয়, যা প্রচলিত নয়। শৈশবে অচল পয়সা কথাটা শুনেছি। ভেবেছি পয়সাটাকে গড়িয়ে দিলে বেশতো চলমান। তাহলে ওটা অচল কেন? পরে বুঝতে পেরেছি পয়সাটা আসল নয়, নকল। তাই তার বিনিময় মূল্য নেই। তাই সে অচল। এখানে 'চল' অর্থে ব্যবহার। যেগুলির ব্যবহার নেই, সেগুলিই অচল।

বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতির সাথে সাথেই মানুষের চাহিদার গগনচুম্বী পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। সেই চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে কালের নিয়মে অনেক জিনিস অচল হচ্ছে এবং হবে। সেই অচল বা বাতিল আমার আজকের প্রতিপাদ্য।

সময়ের অগ্রগতির সাথে আমাদের প্রয়োজন পাল্টায়। চাহিদার পরিবর্তন হয়। রুচি বদলায়। বিনোদনের ধরণ ডিগবাজি খায়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে আগে ব্যবহৃত বস্তুর প্রয়োজন বা চাহিদা মেলেনা। তার ফলস্বরূপ বস্তুটি অব্যবহার্য্য তথা অচল। আমার দেখা বেশকিছু অচল বিষয়বস্তু বিষয়ে আমি কিছু জানানোর চেষ্টা করবো মাত্র।

প্রথমেই যানবাহনের কথায় আসি। এখন ছই লাগানো গরুর গাড়ি প্রায় অচল। ওই গাড়ির মধ্যে বসে দুলকি চালে দুলতে দুলতে মন্থর গতিতে যাওয়ার আনন্দই আলাদা। বিশেষভাবে দূরের আত্মীয় বাড়ি যাওয়া। একসঙ্গে পাঁচ ছ'জন গাড়ির মধ্যে গল্প করতে করতে যাওয়ার মধ্যে একটা থ্রিলিং ভাব থাকে। এক সময় ওই গাড়িই ছিল গ্রামের লোকের প্রধান যানবাহন। তবে বীরভূম, বাঁকুড়া জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে দু-একটার দেখা মিললেও মিলতে পারে। একটু পুরানো দিনের গল্পের চলচ্চিত্রে ছই লাগানো গরুর গাড়ির দেখা মেলার সম্ভাবনা অনেক বেশি। সাধারণ গরুর গাড়িকে বা মোষের গাড়িকে এখনও মাল পরিবহণের কাজে ব্যবহার কম হলেও করা হয়। এখনও ওগুলো বাতিলের দলে পড়েনি।

এককালের পাল্কী-ডুলি সেও বিদায় নিয়েছে। এখন আর পালকি চড়ে বিয়ে করতে যেতে দেখা যায় না। তার জায়গা নিয়েছে এখন ঝাঁ চকচকে ফুলদিয়ে সাজানো চারচাকা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ডুলির দেখা না মিললেও উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের তীর্থস্থানগুলিতে ডুলি এখনও ব্যবহার্য্য তালিকায় রয়েছে। গ্রামে রিক্সা এখনও আছে। মানুষে টানা রিক্সা গ্রামে ছিল না। শহরে ছিল। তবে এখনও পুরোপুরি বাতিল হয়নি। তবে প্রায় বাতিলের দলে। কলকাতার কিছু রাস্তায় ট্রাম আজ অচল। কেবল ট্রাম-লাইন বুক চিতিয়ে শুয়ে।

বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরে বিনোদন মাধ্যমের এবং বিনোদন সম্পর্কিত রুচির বিশাল

পরিবর্তন ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকেও গ্রাম বাংলার কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় হতে দেখেছি। সঙ্গীত প্রধান রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পালাগান। গ্রামের লোকের ভাষায় তা ছিল 'কেষ্টযাত্রা'। তার পাশাপাশি তর্জাগান, কবির লড়াই বা কবিগান, শীতলা মনসার ভাসান, শিবের গান, লেটোর পালা, ধর্মঠাকুরের পালা, পীরের গান ইত্যাদি গ্রামীণ লোকশিল্প দেখতে বা শুনতে পাওয়া যেতো। আজ সেগুলি যেন কোন যাদুমন্ত্রে ভোজবাজির মতো উবে গেছে।

একসময় কলকাতার চিৎপুর যাত্রা পাড়ার পেশাদারি দলের যাত্রা মানুষ পয়সা খরচ করে রাত জেগে শুনেছে। এখন সেই যাত্রাপাড়ার অনেক নামীদামি দলও তার অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। একদিন হয়তো যাত্রাপালাও অচল হয়ে পড়বে। রাতজেগে যাত্রা শোনার লোক পাওয়া যাবে না।

সিনেমা আজও আছে। ছিল এবং থাকবে। যদি এটা ধরে নিই। তাহলে বেশ কতগুলো কিন্তুর জন্ম ঘটবে। সিনেমা শিল্পহিসাবে এখনও তার অস্তিত্ব এবং কৌলিন্য বজায় রেখে চলেছে। কিন্তু গ্রামে, আধা শহরে অনেক সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক হলের অস্তিত্ব বিপন্ন। তারাও অচলের দলে নাম লেখাতে চলেছে। সিনেমার বিকল্প হিসাবে গ্রামে এক সময় ঘাঁটি গাড়ল ভিডিও প্লেয়ার। সেগুলিকে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করে গাঁ-গঞ্জে তৈরি হল ভিডিও হল। ভিডিও হলগুলি কোথায় যেন হারিয়ে গেল। শেষ শরতের মেঘের মতো। ঘরে ঘরে টিভির শোভা বাড়লো। কেবেল, ডিটিএইচের মাধ্যমে ঘরে ঘরে এখন অসংখ্য চ্যানেল।

শিক্ষা এবং বিনোদন মাধ্যম হিসাবে রেডিওর মৃত্যু ঘণ্টা প্রায় বাজতে চলেছে। আগে ঘরে ঘরে রেডিও ছিল। এখন সে অনাদারে অবহেলায় ধূলোমেখে পড়ে থাকে। তার খোঁজ কেউ রাখে না। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গ্রামোফান বা কলের গান কবেই হারিয়েছে। তার বদলে এলো এল.পি. রেকর্ড। রেকর্ড প্লেয়ারও একদিন বিদায় নিল। সেও এখন বাড়ির চিলে কোঠায় বস্তাবন্দী। তারপর বাজারে এলো ঝকঝকে হালকা টেপ রেকর্ডার। তাতে শুধু গান শোনাই নয়, গান রেকর্ড করেও শোনাযেতো। সেও এখন বাতিল।

এখন মোবাইল ফোনেই অডিও ভিডিও রেকর্ডিং-এর ঝামেলা মিটেযাচ্ছে। একসময় এলো অডিও সিডি প্লেয়ার। তারপর ভিডিও-অডিও সিডি প্লেয়ার। শেষে ডিভিডি প্লেয়ার। এখন দৃশ্যশ্রাব্য বিনোদন মাধ্যম মাল্টি চ্যানেল টিভি, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি। এখনতো ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের হাতে হাতেই চিপওয়ালা সস্তাদামের আইপড ঘুরছে। তাদের যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন গান লোড করে নিচ্ছে। সস্তা মোবাইলে চিপ লাগিয়ে সিনেমা, এমনকি ব্লু ফ্লিমও লোড করে নিয়ে গোপনে দেখছে।

এখন বাঙলা ব্যাকরণ রচনার বইতে বিভিন্ন ধরনের পত্রলিখন শেখানোর একটি অধ্যায় আছে। নেহাত কোনো সরকারি বা অন্য দপ্তরে কোনো আবেদন পাঠাতে মানুষ

লিখছেন। নাহলে চিঠিলেখাও ফুরিয়েছে। এখন এস.এম.এস'এর যুগ। কে কষ্টকরে চিঠি লেখে? অনেক হ্যাপা, লেখা খামে ভরোরে, ডাকবাক্সে ফেলোরে। এখন আমার প্রশ্ন "পত্রসাহিত্য আর কখনো লেখা হবে?" উত্তর আপনারা দেবেন।

তবে এস.এম.এস এখনো সাহিত্যের পর্যায়ে এসেছে কিনা জানা নেই। অজ্ঞাতার জন্য লজ্জিত এবং দুঃখিত। টেলিগ্রাম অবলুপ্ত হয়েছে, এ খবর সবারই জানা। ইমেল-এর মাধ্যমে আমরা খবর চালাচালি করি। ইমেল হয়তো একদিন সাহিত্যের পর্যায়ে আসতে পারে।

একেবারে শৈশবে কালির দোয়াত, নিবহ্যান্ডেল ব্যবহার করেছি। তারপর ফাউন্টেন পেন বা ঝর্ণা কলমে লিখেছি। এখন আমরা ডটপেন, জেল পেনের যুগে। লেখার সরঞ্জাম হিসাবে নিবহ্যান্ডেল, ফাউন্টেন পেন বা ঝর্ণা কলম আজ অচল। আমাদের জীবদ্দশায় ডটপেন , জেলপেন অচল হবে কিনা এখনই বলা সম্ভব নয়।

আমাদের ছোটোবেলায় দেখতাম বাড়িতে খাওয়ার থালাবাসন কাঁসার তৈরি। স্টেনলেস স্টিল এসে আমাদের বাসনপত্রেও পরিবর্তন ঘটলো। এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাঁসার বাসন পূজা-অর্চনায়, ঠাকুর দেবতার ভোগ, নৈবেদ্য সাজানোর জন্যই ব্যবহার করা হয়। বাকি ক্ষেত্রে তারা অচল। পাটকরা দামি কাপড়ের মতোই তোলা থাকে। পানের ডাবর, গাড়ু, কলসী, জলের কুঁজো, মাটির হাঁড়ি, মাটির কলসীর ব্যবহার আর নেই। কেবল পূজা অর্চনার ক্ষেত্রেই মাটির বাসনের প্রয়োজন হয়। অবশ্য যাঁরা পূজার স্থায়ী বাসনপত্র হিসাবে তামা এবং কাঁসার বাসন ব্যবহার করেন, তাঁদের কথা আলাদা।

গ্রামে ঢেঁকি আর নজরে আসে না। ধান থেকে চাল তৈরির কাজে বা চালগুঁড়ি তৈরি জন্য ঢেঁকির জমানা শেষ। এখন ধান ভানানো হাস্কিং মিলে। চালগুঁড়ি তৈরি গমভাঙ্গা মেসিনে বা বাড়িতে মিক্সার কাম গ্রাইন্ডারে। বাজারে এখন গুঁড়োমশলা অঢেল। বাটনা বাটার যুগ শেষ। তাই শিলনোড়াও অচল। আবার প্রয়োজনে মশলা গুঁড়ো করতে বা বাটা মশলা পেতে সেই মিক্সার কাম গ্রাইন্ডার। এখন গ্রামের ঘরণীদেরও একই আওয়াজ 'শিলনোড়া দূরহটো'।

যাঁতার ছবি পাঠ্য বইয়ে। কলাই থেকে ডাল বের করতে আর কেউ ব্যবহার করেন না। কলাই থেকে ডাল তৈরিরও মেসিন বাজারে এসে গেছে। শহরে যাঁরা মুড়ি খান বেশির ভাগটাই মেসিনে ভাজা মুড়ি। গ্রামে এখনও কিছ পরিবারে মুড়িভাজার রেওয়াজ আছে। তবে গ্রামেও যেভাবে মুড়িকল গড়ে উঠেছে, বাড়িতে মাটির খোলাখুলিতে মুড়িভাজার ভিডিও সিডি করে রাখতে হবে। নাহলে বিষয়টা ভবিষ্যত প্রজন্মকে বোঝান যাবে না।

একটা সাবেকি পোষাকের নাম বলি। ফতুয়া। সেটি তৈরি করাতে এখন সম্ভবত কোনো দর্জি খুঁজে পাবেন না। দর্জি খোঁজার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। ওটা এককালে বয়স্ক পুরুষদের পোষাক হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখন আর নজরেই পড়েনা।

গহনার কি বিরাট পরিবর্তন এসেছে বা আসতে বাধ্য হয়েছে। আকাশছোঁয়া সোনার দাম। সাধারণ মানুষ মেয়ের বিয়ে বা ওই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ছাড়া শ্যাকরার দোকান মাড়ায় না। ভারী গয়না করাবে কোত্থেকে? তাই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সাবেকী ভারিগয়নাগুলো অচল। তাছাড়া রুচির বদলেও বেশ কিছু গয়না বাতিলের দলে।

বাতিল বা অচল বিষয়বস্তুর খোঁজ করলে আরও অনেক অনেক বিষয় মিলবে। যেমন ছাতা এখন বাতিল হয়নি। কিন্তু তার চেহারায় বদল ঘটেছে। আগের কাঠের হাতলের বা বাঁশের হাতলের ছাতা এখন খুঁজেই পাবেন না। এখন ব্যাগে ব্যাগে বাইফোল্ড, ট্রাই-ফোল্ডের ছাতা। ওতে বাঁচে শুধু মাথা। একটু ঝোড়ো হাওয়ায় উল্টে যা তা। তবুও বহন করার সুবিধার্থে বেশির ভাগ মানুষ ওই ছাতাই ব্যবহার করছেন। আর বড় হাতলের ছাতার এখন নাম কি জানেন? কেউ বলে 'গরু ব্যাপারীর ছাতা' আবার কেউ বলে 'দাদুর ছাতা'। আসলে সেকেলে চেহারার জন্যই অমন নামটা বরাতে জুটেছে। নতুনেরা আসে প্রবীণকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। এটা জাগতিক নিয়ম। সময়ের পরিবর্তনে আরও কত নব নব আবিষ্কার ঘটবে। ব্যবহার্য সাবেকী জিনিস বাতিলের দলে আসবে। বাতিলের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। একগুচ্ছ নতুন জিনিস আসবে। তার সাথে একগুচ্ছ জিনিস বাতিল বা অচল হিসাবে পরিগণিত হবে।

শেখ দীন মহাম্মদ ও উইলিয়াম হিকির স্মৃতিচারণায় নবাব মোবারক-উদ-দৌলার আমলের মুর্শিদাবাদ ■ ফারুক আব্দুল্লাহ

১৭৭০ সালের ১০ই মার্চ শনিবার নবাব মীরজাফর ও মুন্সি বেগমের পুত্র সাইফ-উদ-দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করলে বাংলার মসনদে বসেন মীরজাফরের অপর পত্নী বাব্বু বেগমের ছেলে মোবারক-উদ-দৌলা। কিন্তু তার আমল থেকেই মুর্শিদাবাদের পূর্ব গৌরব ম্লান হতে শুরু করে নানা কারণে। কিন্তু তবুও তার নবাবীয়ানা কোনো অংশেই কমেনি।

নবাব মোরাকর-উদ-দৌলার আমলে কেমন ছিল রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহর এবং নবাবী আভিজাত্য? সে বিষয়ে প্রাপ্ত নানান তথ্যর মধ্যে রয়েছে তৎকালীন মুর্শিদাবাদ শহরে আগত দু'জন ভ্রমকারীর বর্ণনা। দুজনের মধ্যে একজন হলেন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সৈনিক শেখ দীন মহাম্মদ। অপরজন ছিলেন উইলিয়াম হিকি নামক এক ইংরেজ আইনজীবী।

শেখ দীন মহাম্মদ তার বই 'The Travels of Dean Mahomet'-এ মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটি তিনি চিঠির আকারে লিখেছেন। একটি চিঠি একটি প্রচ্ছদ। ১১নং চিঠিতে লেখকের মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লেখা রয়েছে। শেখ দীন মহাম্মদের বিবরণ অনুসারে তিনি ১৭৭৩ সালের কোনো একদিন রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহর দেখতে যান। এবং শহরের বিশালতা দেখে মুগ্ধ হন। মুর্শিদাবাদ শহরকে তিনি একটি বাণিজ্যিক শহর হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে মুর্শিদাবাদ শহর হল দেশীয় মানুষদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উপযুক্ত স্থান। যেখানে মুঘল, পার্শি, মুসলিম, হিন্দু সবার অবাধ বিচরণ। তিনি বলেছেন এই শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিন্তু গোছানো নয়। তবে শহরের ব্যবসায়িদের বাড়িগুলি নক্সা অনুযায়ী ও উন্নত ইট দ্বারা নির্মিত। শহরে শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদেরই নয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের বাড়িগুলিও ছিল যথেষ্ট ছিমছাম। তার বর্ণনা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ শহর ও শহরতলী মিলে লম্বায় ছিল নয় মাইল। এই বিস্তৃত এলাকার মধ্যবর্তী ফাঁকা অঞ্চলে ছিল নবাব মোবারক-উদ-দৌলা সহ তার উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের প্রাসাদ। তবে নবাবের প্রাসাদ ছিল সবার থেকে আলাদা। প্রাসাদে ছিল সাদা মার্বেল পাথরের নির্মিত চমকপ্রদ খিলান বিশিষ্ট স্তম্ভ। তাতে ছিল নানান বর্ণের পর্দা লাগানো। প্রাসাদের খিলানে দেশীয় বাদকরা প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় নানান বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সুমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করত। প্রাসাদের একপাশে ছিল এঁকেবেঁকে বয়ে চলা ভাগীরথী নদী এবং অন্যপাশে ছিল চক (ফার্সি ভাষায় যার অর্থ বাজার)। যেখানে ঘোড়া, বাজপাখি, গান গাওয়া পাখি সবই কেনা-বেচা করা হত।

দীন মহম্মদ লিখেছেন যে নবাবের জাঁকজমকতা দেখে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তিনি হঠাৎ দেখেন যে, নবাব তার তিন হাজার সঙ্গী সাথী নিয়ে একটি রাজকীয় জুলুষ বা মিছিল করে নিজের এলাকায় একটি মন্দির দর্শনে যাচ্ছেন। প্রত্যেকের পরনেই রাজকীয় পোষাক। এই বিশাল মিছিল ও তার জাঁকজমকতা দেখে দীন মহম্মদ মন্তব্য করেছেন

এই জুলুষ বা মিছিলই তার জীবনে দেখা শ্রেষ্ঠ মিছিল। একটি বড় পালকিতে নবাব মোবারক-উদ- দৌলা বসে আছেন এবং সেই পালকি বয়ে নিয়ে চলেছে লাল পোষাক পরিহিত ষোলজন বেহারা। পালকির শামীয়ানা খুব উজ্জ্বল রঙের কাপড়ে তৈরি তাতে রয়েছে রুপো দিয়ে তৈরি নক্সা। শামীয়ানাটি পালকির চার কোণে চারটে রুপোর দণ্ডতে লাগানো। সব মিলিয়ে পালকিটি দেখতে অনেকটা ডিম্বাকার এবং হাতল ওয়ালা চেয়ারের মতো। নবাব নাজিম তাতেই দুই পা মুড়ে নরম বালিসে গা এলিয়ে বসে আছেন। নবাবের চেয়ারের দুই পাশের হাতলগুলিও সোনার কাজ করা মূল্যবান ভেলভেট কাপড়ে মোড়া। নবাবের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুইজন, যারা অজানা প্রাণীর লেজে নির্মিত চামর দুলিয়ে মাছি তাড়িয়ে চলেছে। এই চামরের হাতল গুলিও রুপোর তৈরি। লেখক বলছেন দীর্ঘদেহী নবাবের মাথায় রয়েছে মসলিনের পাগড়ি। লেখকের অনুমান অনুযায়ী যা প্রায় চুয়াল্লিস হাত লম্বা ও মাত্র চার থেকে পাঁচ গ্রাম ওজনের হবে। পাগড়ির সামনের দিকে পাড় বরাবর রয়েছে ছোটো ছোটো ঝালর যা নবাবের ডান চোখের উপর পড়ছে। পাগড়ির সামনে দিকে বসানো রয়েছে একটি মূল্যবান হীরে। নবাবের পরনে মসলিন কাপড়ের পাতলা পোষাক এবং তার উপরে রয়েছে ক্রিম রঙের রেশমি কাপড়ের লম্বা আলখাল্লা এবং ওই একই কাপড়ের তৈরি পায়জামা। নবাবের পোষাকের ধারগুলি ছিল রুপোতে মোড়া এবং পোষাকের প্রতিটি বোতামও ছিল রুপোর। উটের পশম দিয়ে তৈরি একটি বহুমূল্য শাল নবাবের কাঁধে রাখা আছে। অপর একটি শালা তার কোমরে জড়ানো রয়েছে। তাতে গুজে রাখা আছে নবাবের তরবারি। তরবারিটির সমগ্র হাতলটি সোনার, তাতে হীরে বসানো এবং ছোটো ছোটো সোনার চেন লাগানো। নবাবের জুতোও লাল ভেলভেটা কাপড়ে তৈরি যার চারিধার রূপোতে মোড়া এবং মুক্ত বসানো।

এই মিছিলে দুজন উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ঘোড়ায় চড়ে নবাবের দুই পাশে চলেছেন। ঘোড়ায় উপবিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে নবাবের পোষাকের তেমন কোনো পার্থক্য নেই, শুধুমাত্র পাগড়ীর হীরেটি ছাড়া। নবাবের সামনে এবং পেছনে রয়েছে অসংখ্য সৈন্য। এছাড়া নবাবের সিংহাসনের কাছাকাছি ঘুরছে নবাবের দেহরক্ষীরা। নবাবের হাতে সোনা ও হীরের কারুকার্য খচিত হুকোর নল।

সমগ্র মিছিলে রয়েছে দেশীয় বাদকদের একটি দল। সেই সাথে উটের পিঠে রয়েছে বিরাট আকারের একটি ঢোল। বহু দূর থেকেও যার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এছাড়াও পুরো মিছিলের আগে যাচ্ছে ঘোষকরা। যারা নবাবের আসার আগাম খবর ঘোষণা করতে করতে এগিয়ে চলেছে। এই রাজকীয় মিছিল দেখতে সাধারণ মানুষের ভিড় শুরু হয়েছে। এর পর দীন মহম্মদ লিখছেন যে তিনি নবাবের সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মন্দিরে ঢোকার অপেক্ষা করতে লাগলেন। এবং দেখলেন যে সবাই মন্দির চত্বরে প্রবেশের আগেই বাইরে জুতো খুলে রেখে মন্দিরে প্রবেশ করল। দীন মহাম্মদ নবাব মোবারক-উদ-দৌলার এই জাঁকজমকপূর্ণ জুলুষ বা মিছিলে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে

তিনি সিদ্ধান্ত নেন আরো কিছুদিন মুর্শিদাবাদে অতিবাহিত করার।

নবাব মোবারক-উদ-দৌলার আমলের মুর্শিদাবাদের বর্ণনা উইলিয়াম হিকি নামক একজন ইংরেজ আইনজীবীর স্মৃতি কথা থেকেও পাওয়া যায়। হিকি তার জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিয়ে 'Hickey's Memoris' নামক একটি বই লেখেন। যেখানে স্থান পেয়েছে তার মুর্শিদাবাদ ভ্রমণের নানান স্মৃতিকথাও। তিনি তার স্মৃতি চারনায় উল্লেখ করেছেন যে, তার বন্ধু রবার্ট পট যিনি নবাব মোবারক-উদ-দৌল্লার দরবারে রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই বন্ধুর কাছে বেড়াতে এসেই হিকির প্রথম মুর্শিদাবাদ দর্শন।

হিকি কলকাতা থেকে নৌকায় মুর্শিদাবাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আট দিন জলপথে অতিবাহিত করে অবশেষে মুর্শিদাবাদে পৌঁছান। এদিকে পট তাঁর বন্ধুর আসার খবর পেয়ে আগে থেকেই সব কিছুর সুবন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। হিকি লিখেছেন যে মুর্শিদাবাদে তার নানান স্মৃতির মধ্যে বাংলার নবাব মোবারক-উদ্ দৌলার প্রাসাদে বেড়াতে যাবার কথা স্বভাবতই বিশেষভাবে মনে আছে। নবাব প্রাসাদে যাবার আগের দিন রেসিডেন্ট রবার্ট পট নবাব নাজিমকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, তার বিশেষ অন্তরঙ্গ এক বন্ধুকে নিয়ে পরদিন সকালে তার প্রাসাদে দেখা করতে যাবেন। এবং তাঁর সঙ্গেই প্রাতরাশ স্যারবেন। নির্দিষ্ট দিন সকালে যখন তাঁরা নবাব প্রাসাদে পৌঁছোয় তখন নবাব তাদের সাদর অভিনন্দন জানিয়ে এবং আপ্যায়ন করে প্রাসাদের ভেতরে নিয়ে যান। সাহেবী রুচি অনুযায়ী নবাব তাদের জন্য প্রাতরাশের চমৎকার আয়োজন করেছিলেন। খাওয়া শেষ হলে নবাব নাজিম নিজে তার প্রাসাদের সমস্ত কক্ষ ঘুরে দেখান হিকিদের। সেই সাথে প্রাসাদ সংলগ্ন মনোরম উদ্যান এব নবাবী আস্তাবলও দেখানো হয়। নবাবী জীবনযাত্রার নানান বিচিত্র উপকরণ দেখে হিকি রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন।

এর ঠিক তিনদিন পর সামাজিক শিষ্টতা বজায় রাখার জন্য নবাব মোবারক-উদ্-দৌলা একটি জাঁকজমকপূর্ণ জৌলুষ বা মিছিল সহযোগে রেসিডেন্ট পটের আফজালবাগের বাড়িতে গিয়ে তাদের নৈশভোজের নিমন্ত্রণ করে যান। সেদিন রাতেই হিকিরা সদলবলে নবাবের প্রাসাদে গিয়ে কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে আসেন। এবং সেই সঙ্গে চমৎকার আতসবাজির খেলা দেখেন।

মুর্শিদাবাদে উইলিয়াম হিকির দিন গুলি খুব সুখেই কাটছিল। কিন্ত কলকাতায় কাজের তাড়া তাকে বাধ্য করেছিল দ্রুত মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করতে।

নারী স্বাধীনতার আঙ্গিকে বহু পুরাতন এবং বহু চর্চিত একটি বিষয়। তবু বিষয়টিকে বাছিয়া লইবার একটি কারণ হইল কিছুদিনের মধ্যেই আন্তর্জাতিক নারী দিবস আসিতেছে। সেই আঙ্গিকে এই বিষয়টি নতুন করিয়া ভাবনা চিন্তার দাবী রাখে। একথা অনস্বীকার্য যে নারী স্বাধীনতাকে কেন্দ্রে রাখিয়া অগণিত আলোচনা সভা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আইন ইত্যাদি ইত্যাদি হইয়াছে। তৎসহিত একথাও সত্য যে এতোকিছু আলাপ আলোচনার পরেও সমাজের সমস্ত স্তরে মহিলাদের অবস্থার কিছু অংশে উন্নতি হইয়াছে বটে কিন্তু সে স্বাধীন হয় নাই। স্বাধীন এই অর্থে নহে যে সে স্ব-ইচ্ছায় আপন কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিতে পারে না (যদিও কিছু ক্ষেত্রে সত্যই অসমর্থ) বরং এই অর্থে যে তাহারা না চাইলেও সামাজিক আতস কাঁচের নীচে থাকিয়া যান; যা স্বাধীনতাকে বহুলাংশে পিছাইয়া দেয়।

প্রশ্ন হইল ঠিক কি ঘটিলে নারী নিজেকে স্বাধীন বলিয়া দাবী করিতে পারে। প্রবন্ধকার এই দাবী করেন না যে নারী পুরুষ সমান। ইহা অসম্ভব। নারী, পুরুষ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ক্ষমতাশালী, বা সর্বগুণসম্পন্ন হইতেই পারেন আবার বহুলাংশে হীনতরও হইতে পারেন। এই রচনার উদ্দেশ্য সেই বিষয়ে আলোকপাত করা নয়। দুটি জাতি সমান হইবেনা ইহাই স্বাভাবিক। দুটি মানুষ যখন একে অন্যের থেকে আলাদা হয় তখন সত্যই কোন যুক্তির বশবর্তী হইয়া দুটি জাতিকে সমান বলিয়া দাবী করা হয় তাহা বোধের অতীত। তবে একে অন্যের পরিপূরক বলা যাইতে পারে। যাহাহউক বাগাড়ম্বর ছাড়িয়া মূল বিষয়ে আসি।

একথা অনস্বীকার্য যে বহুবৎসর পর, বহু আন্দোলন বাগবিতণ্ডার পরেও মহিলাদের অবস্থার উন্নতি বিশেষ হয় নাই। হ্যাঁ, এখন তাহারা অনেক নিরাপদ, আইন তাহাদের সাথে আছে। এতটাই সাথে আছে যে তার অপব্যবহারও নিঃসঙ্কোচে করা যাইতে পারে। আছে সামাজিক মাধ্যম্যের অতন্দ্র পাহারা আর সমর্থন। আছে সংরক্ষণ। অভিধানে নতুন শব্দের প্রবেশ ঘটিয়াছে "নারীবাদ"; এতটাই শক্তিশালী শব্দ যে পুরুষেরাও নিজেদের নারীবাদী প্রমাণ করতে পারলে অন্তরে বেশ একটি আত্মপ্রদাস লাভ করিতেছেন। কিন্তু এতকি়ছুর পরেও নারীজীবন তার স্বতঃস্ফূর্তটা নিয়ে বিকশিত হতে বহুলাংশেই ব্যর্থ।

জন্মমুহূর্ত হইতে সে এবং তাহার সমগ্র ক্রিয়াকলাপ আতস কাঁচের নীচে। ইহা জবরদস্তি হয় নাই। ইহা প্রকৃতিগত দান। বাংলা সাহিত্যে বড় সুন্দরভাবে একটি পঙক্তিতে ইহার ব্যাখ্যা আছে : "আপনা মাংসে হরিণা বৈরী"।

কথাটা বড় নির্মম সত্য। ইহাকে উপেক্ষা সম্ভব নয়। নারী দেখিলে পুরুষের যৌনতা জন্মায়, আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। আর জন্মায় অহংকার, ঔদ্ধত্য। নারীকে উপেক্ষা করার। যে পুরুষ নারীতে যত উদাসীন তাহার আভ্যন্তরীণ দম্ভ ততোধিক। কিন্তু বিপদের কথা হল

এইটি যে ভালোবাসা বা উদাসীনতা এই দুই অনুভূতিতেই ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে নারী। একটি শিশু জন্মালে লিঙ্গভেদে পিতামাতার ভিন্ন পরিকল্পনা শুরু হয়, কি সামাজিক কি অর্থনৈতিক। নারী জন্মায়, বড় হয়, বিদ্যালয়ে যায়, বন্ধু তৈরি করে, উচ্চ শিক্ষা নেয়, নিজের কর্মসংস্থান তথা অন্নসংস্থান করে, কাহাকেও ভালবাসে, কাহাকেও ঘৃণা করে সব কিছুই বড় অবধারিত, উন্মুক্ত। নারীর নিজস্ব কিছু নাই। কখনো ছিলনা। সবচাইতে ভীতিকর তথ্য হল সে চায়ও না তাহার নিজের কিছু হোক। তাই নিজের পোশাক পরিবর্তন করতে সে যতটাই আবরণ সন্ধান করে তাহার নিজের জীবন ততোটাই বেআব্রু উন্মুক্ত হইয়া পড়িতেছে। নারী আড়াল চায় পোশাক পরিবর্তন করিতে, ঋতুস্রাব লুকাইতে। এবং সেই আড়াল খোঁজা এতোটাই উন্মুক্ত যে পৃথিবী জানিয়া যায় সে ঋতুমতী। পরোপকারী পুরুষ আসে তাকে আড়াল দেয় আর নিজের মহানতার গৌরব চাটিয়ে নেয়। কিন্তু কেহ একথা বলিতে সক্ষম হয় না ইহা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, ইহাতে আড়াল প্রয়োজন নাই। এবং মজার কথা হইল কেহ বলিলে একজন নারীই তার প্রথম প্রতিবাদ করে। নারীই নারীর সবচাইতে বড় শত্রু এই ধরনের বহুল প্রচলিত বাগধারা ভীষণ বাস্তব সত্য ইহা আজকের দিনে একটি শিশু ও নিশ্চিতভাবে বলিতে পারে।

এখন সমস্যা তো সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু তাহার সমাধান করিবে কে? এইস্থানে এই কথা উল্লেখ করা বোধকরি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হইবে না যে সমস্যার সমাধান করা আর সমস্যাকে নির্মূল করা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। বর্তমান সমাজ সমস্যা সমাধান করিতে চায়। তাই সে সমস্যাকে বাঁচিয়ে রাখিতে সদা সচেষ্ট। ইহার ভিত্তি কিছুটা বাণিজ্যিক কিছুটা সামাজিক। ব্যাধি থাকিলে বৈদ্যকে দরকার হয়, ব্যাধি থাকিলে অগদ ও তাহার বিক্রেতা দুইই সমাজে আদরণীয়। সেই অমোঘ ঔষধি হল সংরক্ষণ, যা কে বৃহৎ দৃষ্টিকোণে এই সামাজিক সমস্যাটির প্রতি একটি কৃত্রিম গুরুত্ব আরোপ বলা যাইতে পারে। এবং যতই এই নিরাময়ের শিকড় সমাজের মাটির গভীরে প্রবেশ করিতেছে ততই সেই শিকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সমস্যার মহীরুহ সমাজের চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। যতবার সমাজ বলিবে নারীকে সবল করিবার জন্য নতুন করে অমুক অমুক অধিকার দেওয়া হইল ততোবার ইহা দুচোখে আঙুল দিয়া দেখানো হইবে যে আদপে নারী সমাজের দুর্বল একটি অংশ মাত্র। সুতরাং নিজেকে প্রকৃত স্বাধীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হইলে নারীকে তাহার জন্য নির্মিত সমস্ত বিশেষ অধিকারকে দৃঢ়ভাবে বর্জন করিতে হইবে। ইহা কঠিন। এতদিন ধরে ভোগে আসা ভীষণ সুলভ কোনো পক্ষপাতকে স্বীয় আগ্রহে বর্জন করা শুধু কঠিন নয় অসম্ভবও বটে। কিন্তু এখানেই স্বাধীনতার অহংকার। নারীকে স্বাধীন হইতে চাইলে নিজেকে নগ্ন, বেআব্রু করা ভীষণ জরুরি। এই নগ্নতা একাকী শরীরের নয়, ইহা মনেরও নগ্নতা।

একথা অনস্বীকার্য, আমাদের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে পশু পাখীরা স্বাধীন। ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, খেলা করে, মল মূত্র ত্যাগ করে, যৌনতায় অংশ নেয় প্রকাশ্যে। কোথাও বাধে না। আমরাও ইহাদের অবজ্ঞা করি, ঠিক অবজ্ঞা নয় আমরা ইহাদের লইয়া চিন্তিত

নই। এরপরেই আসে মনুষ্য সমাজের একদম রাস্তায় জীবন কাটানো ভবঘুরেকুল। ইহারাও অনেকটাই পশুর মতো। নিজের জীবনে স্বাধীন। ইহাদের দেখে আমাদের আকর্ষণ, বিকর্ষণ কিছুই হয় না। James Joyce-এর A Portait of the Artist as a Young Man শীর্ষক উপন্যাসে লেখক ইহাকেই নান্দনিকতার শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা হিসেবে তুলে ধরেছেন। যা আমাদেরকে আকর্ষণ বা নিরাকরণ দুয়েরেই উপরে নিয়ে গিয়ে এক অচর অবস্থায় নিয়ে যায়। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডি এইচ লরেন্স ও এক বিখ্যাত উপন্যাসে বলেছেন ."Speech travels between the separate one where there is perfect oneness there is perfect silence of bliss."। সুতরাং "আমরা", "ওরা" বর্জনীয়।

মনে রাখিতে হইবে যে স্বাধীনতা বিভিন্ন রকমের হইতে পারে; যথা অর্থনৈতিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি। এবং একথাও সঠিক যে একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবে এক্ষেত্রে রচনার মূল উপজীব্য বিষয় হল সামাজিক স্বাধীনতা। যাহা অনেকাংশেই আমাদের মানসিকতার সাথে জড়িত। এবং তাহা নারী পুরুষ নির্বিশেষে। একজন মহিলার সামাজিক স্বাধীনতা প্রাথমিক শর্তই হইল যে সে যেকোনো সময়ে, যেকোনো পোশাকে যেকোনো স্থানে যেতে পারে এবং তাকে এজন্য বিচ্ছিন্নভাবে অপরের কৌতুহলী দৃষ্টির বিশ্লেষণের আওতায় আসতে হয় না। এজন্য আন্দোলনের দরকার নেই। কোনো কিছু প্রতিষ্ঠার দরকার নেই। নিজেকে স্বাধীন প্রতিপন্ন করা স্বাধীনতার সবচাইতে বড় অন্তরায়। উভয় পক্ষের কঠিন উদাসীনতা এখানে একমাত্র শ্রেয়। নচেৎ "আমরা স্বাধীন হইতেছি" প্রমাণ করিতে হইবে আমরা স্বাধীন ছিলাম না।

অর্থাৎ যাহারা যতই সমান হইবার আশায়, বড়ো হইবার আশায় সুর চড়াইবে ততই তাহারা যে পিছিয়ে আছে বা ছিল তাহা দৃঢ় ভাবে প্রমাণ হইবে। সংরক্ষণ, বা বর্তমানে সমাজ থেকে আহৃত বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলিকে নির্মমভাবে বর্জন করা ভীষণভাবে শ্রেয়। ইহা বুঝিতে গেলে বিশেষ শিক্ষিত বা সমাজ বিজ্ঞানী হইতে হয় না যে, সংরক্ষণ আদপে কোনো না কোনো ভাবে দয়া দাক্ষিণ্যের সহিত যুক্ত।

সুতরাং সংরক্ষণ বর্জন করা হোক। দয়া পরিত্যাগ করা হোক। নচেৎ কেউ বলতে পারে না কবিগুরুর কথা মেনে আজ যাকে সংরক্ষণের দোহাই দিয়ে মহিলা কামরা হইতে নীচে নামিয়ে দেওয়া হইতেছে সময়ের অমোঘ নিয়মে তাহারাই একটি গোটা জাতিকে নিজ পদপ্রান্তে রাখিয়া প্রতিশোধের সুখ অনুভব করিবেন না।

এক বিস্মৃত শিক্ষাশিল্পী ■ রথীন কর

উনিশ শতকের বঙ্গভূমিতে পাশ্চাত্য প্রভাবে নবজাগরণের যে দোলা লেগেছিল তার পথিকৃৎ ছিলেন নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের উচ্চকোটি শ্রেণির একদল প্রাণোচ্ছল তরতাজা তরুণ যাঁরা ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। এঁদের দীক্ষাগুরু ছিলেন ছাত্রদেরই প্রায় সমবয়সী এক ফিরিঙ্গি শিক্ষক যাঁর নাম হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। এঁদের বলা হত 'ইয়ং বেঙ্গল' 'ইয়ং ক্যালকাটা' বা স্রেফ 'ডিরোজিয়ান' এপর্যন্ত ব্যাপারটি অনেকেরই আয়ত্ত্বাধীন। যদি প্রশ্ন করা হয় এঁদের নেতাকে তৈরি করেছিলেন কে অথবা এই মুক্ত চিন্তার বীজটি বপন করেছিলেন কে?

উত্তরে বলি মুক্ত চিন্তক 'ঝড়ের পাখি' ডিরোজিও'র বনিয়াদ তৈরি হয় ছ'বছর বয়ঃক্রম থেকে চোদ্দো বছর যে বিদ্যালয়ে, সেই শিক্ষাগারের নাম ছিল 'ধর্মতলা এ্যাকাডেমি' এবং যে শিক্ষকের প্রভাবে ডিরোজিওর বৌদ্ধিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, তাঁর নাম ডেভিড ড্রামন্ড, ড্রামন্ডের জন্ম হয়েছিল ১৭৮৫ মতান্তরে ১৭৮৩ সালে স্কটল্যান্ডের ফাইপনায়ারে।

ইউরোপে মানস জগতে আধুনিকতার উদ্ভব এবং বিকাশ হয় এক যুগান্তব্যাপী আলোড়নের মাধ্যমে যা ইতিহাসে 'রেনেসাঁস' নামে অভিহিত হয়ে আছে। চিরায়ত গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্য ও শিল্পকলার পুনর্জন্মের মাধ্যমে এই নবজাগরণ প্রক্রিয়ার সূচনা। মোটামুটিভাবে, মধ্যযুগের শেষে চতুর্দশ শতকের শেষার্ধ থেকে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতক পর্যন্ত এর বিস্তৃতি, যে আধুনিক মানস চেতনার উদ্ভব, বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রেনেসাঁসের মাধ্যমে সেই মুক্তমানসের চিন্তন প্রণালী পরবর্তী শতকগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল, এর ফলস্বরূপ অষ্টাদশ শতকের 'আলোকায়ন' আন্দোলনে আধুনিক জীবন দর্শনের আত্মবিকাশ ঘটেছিল। আত্মনির্মিতির নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং মানবতন্ত্রী প্রতিন্যাসের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল অষ্টদশ শতকে। মুখ্য ধারক ও বাহক ছিলেন তৎকালীন কিছু ব্রিটিশ ও ফরাসি চিন্তক এবং দার্শনিক, ভলতেয়ার, বেইল, গডউইন, হিউম, দিদেরো প্রভৃতি মনীষীর নাম উল্লেখ্য। অভিজ্ঞতাবাদ ও সংশয়বাদের মুখ্য প্রবর্তক এবং জিজ্ঞাসাহীন সর্বপ্রকার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে নিরলস যোদ্ধা ডেভিড হিউম (১৭১১-৭৬) ছিলেন ড্রামণ্ডের মানসিক দীক্ষাগুরু। ভাগ্যতাড়িত ড্রামন্ড যখন এদেশে আসেন তখন তাঁর বয়স আটাশ।

ধর্মতলা চাঁদনির কাছে ছিল ড্রামন্ড সাহেবের স্কুল—সম্ভবত ৪৬, ধর্মতলা স্ট্রিটে। বিদ্যালয়টির উত্তরে ছিল এক গুমঘর, পশ্চিমে হসপিটাল স্ট্রিট, দক্ষিণে ধর্মতলা এবং পুবে হাট সাহেবের ঘোড়ার আস্তাবল। আরও দুটি বিশিষ্ট বিদ্যালয় ছিল তখন—আদি ব্রাহ্ম সমাজের কাছে শেরবোর্নের স্কুল, বৈঠকখানায় ছিল হাটমানের স্কুল, এই তিনটি বিদ্যালয়ে তখন সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারের সন্তানদের ইংরেজি বিদ্যা আয়ত্ত্ব করার জন্য পাঠানো হত।

অন্য ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়গুলি থেকে ধর্মতলা অ্যাকাডেমির গুণগত পার্থক্য ছিল। এর কর্ণধার ডেভিড ড্রামন্ড নিজ আত্মজন, মাতৃভূমি ত্যাগ করে সুদূর স্কটল্যান্ড থেকে এদেশে এসেছিলেন, এবং আলোকিত করে গেছেন আমাদের মনীষা এবং চিন্তনকে। তিনি ছিলেন দর্শন ও সাহিত্যের অনুরাগী, দেশ-কাল সম্প্রদায়-বর্ণ-ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তচিন্তার অধিকারী এবং কবিতা ও সাহিত্যসৃজনে পারদর্শী। দার্শনিক হিউমের একনিষ্ঠ ভক্ত এই স্কচম্যানের সাহিত্য ও দর্শন সংক্রান্ত প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হত সমসাময়িক পত্রিকায়। তবে তাঁর ভারতবর্ষে পদার্পণের আগেকার বিস্তৃত তথ্যপঞ্জি প্রায় অলভ্য। ধর্মতলা এ্যাকাডেমিতে সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে নিষ্টা, উদ্যম এবং আত্মপ্রত্যয়ের জোরে প্রতিষ্ঠানটিকে তদানীন্তন কলকাতার শ্রেষ্ঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলেন।

ড্রামন্ডকে নিয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে .'The Oriental Magazine' পত্রিকায় (Vol. 1 June 1843.No.6)। টি.বি. লরেন্স সম্পাদিত ইংলিশ পোয়েট্রি ইন ইন্ডিয়া' নামীয় কাব্যসঙ্কলন (১৮৬৯ খ্রি.) ড্রামন্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ একটি কবিতা মুদ্রিত হয়। ডিরোজিওর প্রথম জীবনীকার টমাস ওডওয়ার্ডস ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে ডিরোজিওর চরিত্র গঠনে ড্রামন্ডের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সুরেশচন্দ্র মৈত্র তাঁর 'অশান্তকাল : জিজ্ঞাসু যুবক' গ্রন্থে ড্রামন্ড সম্পর্কে একটি অধ্যায় সংযোজিত করেন।

হিউম রচিত দার্শনিক বীজগ্রন্থ 'Treatise of Human Nature' প্রকাশিত হয় ১৭৩৯ সালে। যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লব্ধ বা যুক্তিসিদ্ধ নয় সেরকম ধারণা বা তত্ত্ব হিউমের কাচে গ্রহণযোগ্য ছিল না। জিজ্ঞাসাহীন গোঁড়ামির পরিবর্তে এই সংশয়বাদী আত্মজিজ্ঞাসাই চেতনার নবজাগরণ—মূঢ়তা থেকে মানবিকতাতন্ত্রে উত্তরণ। ড্রামন্ড ছিলেন স্বাধীনচেতা, প্রগতিপন্থী, সংশয়বাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ। তাঁর বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় ইউরেশিয় এবং ভারতীয় ছাত্ররা একত্র অধ্যয়ন করতো এবং সকলর পাঠ্যক্রম এক ছিল।

ড্রামন্ডের পিতা ছিলেন ইংল্যান্ডের সনাতন গির্জা থেকে বিচ্ছিন্ন ধারার গির্জার পাদ্রি। পরিবারের সঙ্গে গুরুতর মতান্তরের জেরে, বোধহয় ধর্মীয় কারণে গৃহত্যাগ করে ঘুরপথে কষ্টকর জাহাজ যাত্রার শেষে ১৮১৩ সালে ভারতে এসে পৌছাল অলক্ষিতভাবে, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক অনাহূত আগন্তুক। কালকাতায় পদার্পণের কয়েক দিনের মধ্যে বহরমপুরে এক বন্ধুর আতিথ্যকালে রচনা করেন ১৬৮ ছত্রে বিন্যস্ত একটি এলিজি। এতে ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্য সম্পর্কে যেমন তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি সৃজনশীলতার আকুতি ও পরিস্ফুট হয়েছে। আপন প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ এলো মেজার্স ও ওয়ালেশ 'পরিচালিত ধর্মতলা এ্যাকাডেমিতে মাসিক দেড়শত টাকা মাইনের শিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর থেকে। কিছুদিন পরে দেখা গেল বিদ্যালয়টির অন্যতম অংশীদার ওয়ালেশের বিদ্যালয় পরিচালনায় মন নেই। তাঁকে পেয়ে বসলো নাটকের নেশা। তিনি নাট্যশালা চালাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ড্রামন্ডের কাছে প্রস্তাব এলো বিদ্যালয়টির অংশীদারিত্ব ক্রয়ের জন্য। ভেবে চিন্তে ধার দেন করে ড্রামন্ড

অংশীদার মালিক হয়ে গেলেন। এর পরেই শুরু হল তাঁর আচার্যরূপে ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন। পরে তিনি বিদ্যালয়টির পুরোপুরি মালিক হয়ে যান। এবারে তিনি পাঠ্যক্রম, পাঠদান ও পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করেন। প্রাক্-ড্রামন্ড ধর্মতলা এ্যাকাডেমিতে বা এই ধরনের বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত পাঠক্রম ছিল ইংরেজদের বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতির জন্য উপযুক্ত করণিক তৈরি পদ্ধতি। সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানচর্চা, উদারনৈতিক শিক্ষা বা এইসব বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হত।

স্বদেশে ফেলে আসা 'স্কচম্যান' যেমন চারিত্রিক এবং বৌদ্ধিক গুণাবলির অধিকারী হন, ড্রামন্ড সেই স্কটিশ সংস্কৃতির বাহক ছিলেন। ধ্রুপদী সাহিত্যের তন্নিষ্ঠ পাঠক, গণিত ও অধিবিদ্যায় (metaphysics) পারদর্শী, ভদ্র, মার্জিত এব স্বাধীন চিন্তা শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠীর ছেলেদের একসঙ্গে বিদ্যাভাস এবং ক্রীড়ানুশীলন যে সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের সহায়ক এটাই ছিল তার স্থির প্রতীতি, শুধু বুক-কিপিং এব কার্যকরী ইংরেজি শিখে 'ইংরেজ হৌসে' গ্রাসাচ্ছদনের জন্য নয়, পরি পূর্ণ মানবিক বিকাশই শিক্ষালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এটাই ছিল তাঁর আত্মচেতনা। দায়িত্ব গ্রহণের পর ড্রামন্ড ছাত্রদের মানসিক বিকাশে জোর দিলেন ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সুবিধার্থে দায়িত্বশীল ও পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলার ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার মূল্যায়নে যে বিকাশোন্মুখ মনের বিস্তার ঘটে এবং অনুধাবন ও বিচারশক্তির ব্যাপ্তি ঘটে সেটা তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। এই প্রত্যয়ের প্রতিফলন ঘটেছে পাঠ্যক্রমে এবং পাঠদান পদ্ধতিতে নতুন বিধির প্রবর্তনে। ছাত্রদের বিশ্লেষণী শক্তি বৃদ্ধির জন্য সাহিত্যের সঙ্গে ব্যাকরণ পাঠের প্রচলনও শুরু হল। ভূগোলপাঠের নবধারা প্রবর্তিত হল গ্লোব ব্যবহারের মাধ্যমে। ক্ষুদে পড়ুয়ারা হাত ঘোরালেই বিশ্বদর্শনের আনন্দ পেত। ধর্মতলা এ্যাকাডেমি আগে ছিল 'Classical school' পরিবর্তিত নাম হল Classical, Commercial and Mathamatical Academy' ক্ল্যাসিকাল ভাষা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বুককিপিং পাঠন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হল। বিদ্যাশিক্ষা এবং ক্রীড়াশিক্ষার সংমিশ্রণ ঘটলো। নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, অভিনয় এই সব সুকুমার বৃত্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ব্যবস্থা হল। পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে জাতি, ধর্ম, পরিবার ও পরিবেশগত অহমিকা, হীনমন্যতা যাতে না প্রকাশ পায় সেজন্য খ্রিস্টান এবং বিদেশি ছাত্রদের একসঙ্গে পাশাপাশি বসে পাঠগ্রহণ, সমবেত ক্রীড়ানুষ্ঠান বা আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিধর্ম নির্বিশেষে এক উদার পরিবেশের সৃষ্টি হয়। যুক্তি, প্রতর্ক, পর্যবেক্ষণের ওপর গুরত্ব আরোপ করা হল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল পাঠ সমাপনান্তে ড্রামন্ডের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষের অর্ধালোকিত স্বল্প পরিসরে পুঁথিগত বিদ্যার উদগীরন না, পরীক্ষা গ্রহণ ব্যাপারটা একটা সামাজিক উৎসবে পরিণত হত। অভিভাবক, সমাজের সম্মাননীয় ব্যক্তি, সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত হতেন। পরীক্ষা গৃহীত হত সর্বসমক্ষে। সফল হলে তাৎক্ষণিক পুরস্কার, না পারলে অন্তর্নিহিত লজ্জাবোধ সেই ছাত্রকে ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য দৃঢ়মনস্ক করে তুলত। নৃত্য, গীত, আবৃত্তি, অভিনয়,

কিছুই বাদ যেত না। ড্রামন্ড প্রত্যেক শ্রেণির ছাত্রদের একে একে ডাকতেন, তাদের অগ্রগতির অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতেন, প্রশংসা করতেন তাদের শ্রম, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার। বাইরের পরীক্ষক পরীক্ষা পরিচালনা করতেন।

এইরকম পরিবেশে বালক ডিরোজিও ভর্তি হয় ড্রামন্ডের বিদ্যালয়ে। অচিরেই ড্রামন্ডের জহুরি মন এই খুদে পড়ুয়াকে সনাক্ত করতে ভুল করেননি। কশেরুকা ঋজু রেখে উন্নত শিরে অপাবৃত সত্যকে জীবনের ধ্রুবতারা করে করার যে শিক্ষা গুরু ড্রামন্ড প্রচলন করেছিলেন, সেই শিক্ষায় নিজেকে দীক্ষিত পর্তুগিজ তনয় ডিরোজিও তৎকালীন সমাজজীবনে যে ঝোড়ো হাওয়া নিয়ে আসবেন এটাইতো প্রত্যাশিত। পরীক্ষায় ছাত্র ডিরোজিও স্বর্ণপদক পেত। দেশীয় ছাত্র হরিদাস বোস ইওরোপীয় সাহিত্য, বুক-কিপিং ও ভূগোলে অসামান্য দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল, আর এক দেশীয় ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিল।

গাত্রবর্ণের সঙ্গে বুদ্ধি বৃত্তির যে কোনো সম্পর্ক নেই ড্রামন্ড সে যুগেই সেটা হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। বিদ্যালয় থেকে বিদায়কালে তিনি হরিদাস বোসকে বলেছিলেন —You are now to enter on the world and must in some degree be subjected to its wayward prejudices and there are prejudices in every country and among every people. I trust, however, you will never bend there from true dignity of knowledge. (Calcutta Journal 24 Dec. 1821). সমস্ত রকম মূঢ়তার উর্ধ্বে ওঠা একজন আদর্শ শিক্ষকের তো এরকম জীবনবীক্ষাই থাকা উচিত। তখনকার অনেক মিশনারি বা ইংরেজ প্রবর্তিত বিদ্যালয়ে সেই ধর্মীয় এবং গোঁড়ামিতে প্রবেশ করতে দেননি কিন্তু ছাত্রদের নৈতিক শৃঙ্খলা শিক্ষার জন্য রবিবার তাদের গির্জায় নিয়ে যেতেন। উদারমনস্ক শিক্ষণশৈলী এবং দেশিয় ও ইওরোপীয়দের মধ্যে ভেদাভেদহীনতা প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীকে উজ্জ্বলতর রূপে বিকশিত করতে সাহায্য করেছিল, এখানেই আচার্য হিসেবে 'কুঁজো স্কচম্যান' ড্রামন্ডের সার্থকতা।

রেভারেন্ড ডাঃ ব্রাউন একবার পরীক্ষা গ্রহণ করতে এসে ছাত্রদের দক্ষতা সম্পর্কে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাা করেন। 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে (২৩ ডিসেম্বর, ১৮২৮) বলা হয়— Durmotollah Academy needs no eulogy of yours to enhance its merit and well established reputation. পরবর্তীকালে স্বয়ং ডিরোজিওই পরীক্ষক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর মতে The most pleasing feature in this institution is its freedom from illibereality (India gazette 21, Dec, 1829)

সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতিরেকে ড্রামন্ড কিছুই বিশ্বাস করতেন না, এটি তাঁর ভাবগুরু হিউমের প্রভাব। মননশীল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তার একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল .'Objection to Phrenology' (1829) ক্যালকাটা ফ্রেনোলজিক্যাল সোসাইটির বিভিন্ন অধিবেশনে যোগদানের অভিজ্ঞতায় তিনি এটিকে অপবিজ্ঞান ছাঁড়া কিছু মানতে চান নি। এ নিয়ে তখনকার বিদ্বজ্জন মহলে প্রতর্ক দানা বেঁধে উঠেছিল। 'Weekly Examiner' নামে একটা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন ড্রামন্ড

১৮৪০-এর মার্চ থেকে ১৮৪১-এর জুলাই পর্যন্ত। তিনি ছিলেন নিখিল মানবতাবাদী, জাতি, ধর্ম ও বর্ণের একেচটিয়া শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর আস্থা ছিল না। প্রতিবাদী কবি রবার্ট বার্নস ও টমাস ক্যাম্ববেল ছিলেন তাঁর কাব্যগুরু। বহুমাত্রিক মানুষ ছিলেন ড্রামন্ড, আদর্শ শিক্ষক, মননশীল দার্শনিক এবং সমাজ সচেতক হিসেবে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

বয়সজনিত কারণে ক্রমশ শরীর ভেঙে পড়ছিল। একদিকে অন্য খ্রিস্টান বিদ্যালয়গুলি ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে লাগল, অন্যদিকে হিন্দু অভিভাবকরা খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি কিছুটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন। প্রিয়তম ছাত্র ডিরোজিওর হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়ন ও পরে অকাল মৃত্যু (১৮৩১) তাঁকে শোকবিহ্বল করে তুলল। সহযোগী উইলসনের হাতে দায়িত্বভার তুলে দিয়ে সিঙ্গাপুর যান স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে। এদিকে, 'ধর্মতলা এ্যাকাডেমি' ভেরুলাম এ্যাকাডেমির সঙ্গে একত্রীভূত হয়ে গেল। বাঙলার নবজাগরণের পটভূমি তৈরি করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অচিরেই অবলুপ্তি হল তার।

আর সেই গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের যিনি কর্ণধার ছিলেন, ছাত্রদরদী অসামান্য শিক্ষক ও সংগঠক কুঁজো স্কচম্যান' এর কী হল? খুবই হৃদয়বিদারী সে কাহিনি। অসুস্থতা তো ছিলই সঙ্গে যুক্ত হল আর্থিক অনটন। সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে টানা দু'বছর হাসপাতাল বাস, শুয়ে শুয়েই ভাঙাগলায় গান ধরতেন কেলটিক সুরে, কবিতা লিখতেন। সুদূর স্কটল্যান্ডের 'লিভেন' নদীর স্বপ্নমেদুরতা তাঁর চোখেমুখে। ১৮৪১ সাল থেকে মেরুদণ্ডের রোগে আরও ন্যুব্জ হয়ে পড়লেন। এই অবস্থাতেও তাঁর সৃজনী ও সমালোচক সত্তাকে জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, শারীরিক কষ্টকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন সভায় গেছেন—প্রতিবাদী কলম ধরেছেন। তার্কিক আলোচনায় নিজেকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, ১৮৪৩ সালের এইচ. বি. গার্ডেনার নামে এক প্রিয় ছাত্রের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের খ্রিস্টান সমাধি ক্ষেত্রে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর সমাধিফলক এখন অযত্নমলিন। আয়তাকার সমাধি ক্ষেত্রের চারকোণে চারটি অবনত মশাল। স্মৃতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে, .'Beneath lie the mortal remains of David Drummond, a native of Scotland, and many years, a successfull teacher of youth in the city. He defarted the life on 28th April 1843, aged 43 years.

এটাই কি এই মহান শিক্ষাশিল্পী ও মানবতাবাদীর জন্য শেষ শংসাপত্র?

বাঙলা ভাষা সৃষ্টি ও বিকাশের কথা ■ রুদ্র সুশান্ত

১

ভাষা পরীক্ষাগারে কিংবা বিজ্ঞানের কল্যাণে আবিষ্কার নয়, ভাষা মূলত দৈনন্দিন জনজীবন থেকে আগত অর্থাৎ আমরা ভাষাকে সমাজে বিরাজমান উপ্পাদানগুলোর একটি হিসেবে ধরে নিতে পারি। গুছিয়ে বললে আমরা এভাবেও বলতে পারি— ভাষা হলো সামাজিক আবিষ্কার। সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় ভাষা প্রবাহমান। কখনো বিশাল ঢেউ আবার কখনো ছোটো ঢেউয়ের মতো করে ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে অধিক বা অনধিক রূপে। বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানী ও ভাষাবিদদের চিন্তা এবং তাদের উপলব্ধি হতে বলা যায় ভাষা মূলত আবিষ্কৃত হয়েছে তখন থেকেই যখন থেকে মানুষ বড়ো হতে শুরু করেছে। সামাজিক বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা জানতে পেরেছি পূর্বে মানুষ একত্রিত হতো ক্ষুধার তাগিদে পশু শিকার করার নিমিত্তে। তখন তারা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য জিহ্বা, কান, গলা, মস্তিষ্ক ও বাকযন্ত্রের সাহায্য নিয়ে সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করতো।' এটাকেই ভাষা আবিষ্কারের উষালগ্নের ইতিহাস বলে ধরে নেওয়া যায়। মানুষ যখন থেকে নিজের মস্তিষ্ককে আস্তে ধীরে ব্যবহার করতে শিখলো তখন থেকেই ভাষা ব্যবহার শুরু হলো।

২

বাঙলা ভাষা সৃষ্টির ইতিহাসও এমন হতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন। তবে এই ভারতবর্ষে কবে থেকে মানুষ বসবাস করছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি অর্থাৎ তার সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে বহু ভাষাবিদরা অনুমান করেছেন—বাংলা ভাষা হয়তো অন্যান্য ভাষার সমকালীন সময়েই সৃষ্টি হয়েছে। এর ভিন্নও হতে পারে। তবে ভাষার সৃষ্টি সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন— 'যখন মানুষের গতি প্রকৃতি অঙ্গভঙ্গি থেকে বাকযন্ত্রের গতিতে পরিণত হলো তখনই ভাষার উৎপত্তি হলো। প্রথমে গতি, পরে অঙ্গভঙ্গি শেষে ভাষা। এটাই হলো ভাষার জন্মকথা। বাঙলা ভাষার সৃষ্টি আসলে কোনো সময়ে হয়েছে তার সুনির্দিষ্ট কোন দিন/কাল আজ পর্যন্ত ভাষা চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীরা সুনিশ্চিত করে বলতে পারেননি। তবে খন্দকার মাহমুদুল হাসান তাঁর মানুষের উৎপত্তি ও জাতিসমূহের সৃষ্টি বইটিতে লিখেছেন— ''পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ভাষাভাষী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার একটি শাখা থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বাঙলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে বলে ভাষাবিদদের ধারণা।

৩

বিভিন্ন ভাষাবিদদের বই পড়ে জানা যায়—বাঙলা ভাষা মূলত এসেছে প্রাকৃত ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষা বলতে আমরা বুঝি যে ভাষা প্রকৃতি থেকে লাভ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে লাভ করা মানে সাধারণ জনগণের ভাষা। এভাবেও বলতে পারি—

সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। সেই সাধারণ মানুষের ভাষা প্রাকৃত ভাষা থেকেই বাঙলা উৎপন্ন হয়েছে। বাঙলা ভাষা সৃষ্টি হবার পূর্বে এই অঞ্চলের সাহিত্যিকরা সংস্কৃত প্রাকৃত ও শৌরসেনী এই তিন ভাষায় সাহিত্য রচনা করতেন। তবে বেশিরভাগ সাহিত্যিকরাই সংস্কৃত ভাষাকে সম্মানের ভাষা বা শক্তিশালী ভাষা হিসেবে মনে করতেন। তাই এই অঞ্চলের প্রাচীন সাহিত্যগুলো সবকটাই প্রায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সাহিত্যিকগণ এ ভাষাই ব্যবহার করতেন।

৪

বলা হয়ে থাকে ৭৫০ থেকে ১১৫০ সাল মতান্তরে ৮০০ থেকে ১১০০ সালের মধ্যে বাংলা ভাষা শক্তিশালী অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কিন্তু তখনও বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। ১৯০৭ সালে নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন ''চর্যাগীতি'' আবিষ্কার করেন। তখন তিনি চর্যাগীতির ভাষা দেখে বলেন— চর্যাগীতির ভাষা বাঙলা ছাড়া অন্যকোনো ভাষা নয়। যে সন্ধ্যা ভাষায় চর্যাগীতি রচিত হয় তা বর্তমান সমাজে অপ্রচলিত কারণ চর্যাগীতির সময় বাঙলা ভাষা সবেমাত্র ভাষার জরায়ু থেকে জন্মলাভ করেছে। ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতকে যুক্তিযুক্ত অবস্থানে নিয়ে আসেন এবং শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিশ্লেষণধর্মী 'Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন চর্যাপদের ভাষা বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা নয়। চর্যাপদ/চর্যাগীতিকে বাঙলা ভাষার আদি নির্দশন হিসেবে গণ্য করা হয়। পরবর্তীতে পাল বংশের শাসকরা বাঙলা ভাষার বিস্তার লাভের জন্য সহযোগিতা করেছেন এবং সাহিত্যিকদের বাঙলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করার জন্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

৫

বাঙলা ভাষা বিস্তরভাবে প্রচলিত ও প্রচারিত হয় বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা। বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে বুড়ো চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি দ্বিজ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, লালন সাঁই, মাগন ঠাকুর এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আবার রামনিধি গুপ্ত ও বাঙলা বহু কাব্য রচনা করে বাঙলা ভাষাকে আরো সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী করেছেন। এঁরা ধীরে ধীরে বাঙলা ভাষার ভিত শক্ত করেন। ১৫০০ সাল থেকে বর্তমান সময়কে বলা হয় বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ। ১৫০০ সালের পর থেকে বাঙলা ভাষার ব্যাপক পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটে। উনিশ শতকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলা ভাষাকে দু'হাত ভরে দিয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক, আগে এবং পরে অনেকেই বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। তবে বাঙলা ভাষা এখন যথেষ্ট শক্ত অবস্থানে রয়েছে। আধুনিক যে বাঙলা ভাষা তাতে যাঁদের অবদান উল্লেখ না করলেই নয় তাঁর হলেন—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র কুমার রায়, পাঁচকড়ি দে, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র

মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, মনীশ ঘটক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, সমরেশ বসু, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আজাদ, শ্যামসুন্দর রহমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমান, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, মহাশ্বেতা দেবী, বেগম রোকেয়া, শঙ্খ ঘোষ, সৈয়দ শামসুল হক আরও অনেকে। এইসব কবি সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষাকে দু'হাতে ধন রত্ন দান করেছেন। কালেকালে যাঁরা বাঙলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করে এই ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বাঙলা ভাষাভাষী সম্প্রদায় তাঁদের ঋণ স্বীকার করে চলবে।

৬

বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৫২ সালে রক্তের বিনিময়ে আমরা এ মহান ভাষার সম্মানরক্ষা করি। বাঙালি একমাত্র জাতি যাঁরা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপিতা শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাঙলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করে বাঙলা ভাষাকে আরো সম্মানের জায়গায় নিয়ে গেছেন। বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব করার কারণ। একটি বিষয় আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি—পৃথিবীতে এতো ভাষা থাকা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা হিসাবে বাঙলা ভাষার অবস্থান চতুর্থ।

পঞ্চানন কর্মকার : জন্ম ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে, হুগলি জেলার জিরাট, বলড়ের চারাবাগান বলে একটি স্থানে। অন্যপক্ষে, হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে এবং প্রয়াত হন ১৮০১-এ। পিতা—শম্ভুচন্দ্র, পিতামহ—নিমাইচন্দ্র, যিনি নবাব আলিবর্দির দরবারে খোদাই ও ধাতু অলঙ্করণের কাজে যুক্ত থেকে 'মল্লিক' উপাধিতে ভূষিত হন। একথা জানাচ্ছেন ডঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায়, তাঁর 'বাঙলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক' নামক গবেষণা পত্রে। পঞ্চানন বাবার কাছে কাজ শিখে নেন, সাথে সাথে খোদাই ও অলঙ্ককরণের কাজ (যা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত) করতে থাকেন নৃসিংহ দেবরায়ের অধীনে।

কোম্পানির বোর্ডের কিছু উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি, এ সময়কালের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। সাথে সাথে যুক্ত হয় বিশেষ কিছু ইংরেজ চরিত্র।

চাকরির আশায় বিলেত থেকে ইংরেজ কর্মচারীরা এদেশে আসছেন।

১৭৭২ : ন্যাথিনিয়েল ব্রাসি হালেদ, কোম্পানির রাইটার বা লিপিকার, ফার্সী ভাষা চর্চা করছেন। সে সময় (নবাবী আমলে,) ফার্সি ভাষায় কাজকর্ম হত। পণ্ডিত, মুন্সিগণের সহায়তায় অনুবাদের কাজ শুরু করলেন।

১৭৭০ : এলেন চার্লস উইলকিন্স। তিনিও হালেদের মত অনুবাদকের কাজ করতে এলেন বাংলা চর্চা শুরু করলেন। হালেদের বন্ধুও বটে। একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। বাংলায় মুদ্রণ ও হরফ শিল্পসহ অন্যান্য কাজ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি গঠনে ভূমিকা ছিল তাঁর। 'অনারেবল কোম্পানীজ প্রেস' স্থাপনে পথিকৃৎ তিনি। দুইজনই যখন ভারত তথা বাংলায় এসেছিলেন বয়স তাঁদের কুড়ি বা একটু বেশি।

১৭৭২ : বড়লাট হয়ে এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক সংস্কারে হাত লাগালেন।

মুহম্মদ সিদ্দিকি খান, তাঁর 'হ্যালহেডের বাংলা চর্চা প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, (চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন' ১৯৭৮, আনন্দ), হালেদ সাহেব বলেছিলেন, বাংলা এদেশের দেশীয় ভাষা ও যার মাধ্যমে কাজ শুরু করলে প্রজাদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌছানো যাবে এবং প্রশাসনিক কাজ অনেক সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে

বাংলা ভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গে হালেদ সাহেবের এমন সুপারিশ যদিও ইংরেজ তথা কোম্পানির কাজকে ত্বরান্বিত করার এক বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনা, তথাপি বলা চলে দেশীয় ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব প্রদানের এটি একটি মুখ্য সোপান হিসাবে কাজ করেছে।

হেস্টিংস-এর প্রশাসনিক সংস্কার ভাবনায় হালেদের এমন চিন্তাশীল সুপারিশ গতি এনে দিয়েছিল। তিনি ভাবলেন, কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে সরকারি কাজের বিষয়বস্তু ও গুরুত্বকে সুনির্দিষ্টভাবে স্থাপন করতে হলে, রাজকর্মচারীদের দেশীয় ভাষা চর্চাও জরুরি। দেশীয় ভাষা চর্চা করতে চাই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ। তিনি দায়িত্ব দিলেন

চার্লস উইলকিন্স এবং ন্যাথিনিয়েল ব্রাসি হ্যালেদকে। হালেদ ইতিপূর্বে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন A Code of Gentoo laws' প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডনে এবং সেটি ১৭৭৬ সালে। তাতে বাংলা বর্ণমালার একটি ব্লক ছাপা হয়েছিলা।

বড়লাট হেস্টিংস-এর অনুপ্রেরণায় ও আর্থিক অনুগ্রহে এবং অপর দুই ইংরেজ রাজকর্মচারী ও ভাষাবিদদের প্রচেষ্টার ফল হিসাবে ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হল 'A Grammar of the Bengal Language'

যদিও গোটা গ্রন্থটি ইংরেজিতে লেখা এবং তা মূলত রাজকর্মচারীদের বাংলা শেখানোর জন্য, কিন্তু প্রায় আড়াই শত পাতার প্রতি পাতা জুড়ে বাংলা বর্ণ, শব্দ ও বাক্যে পরিপূর্ণ। আটটি অধ্যায়ে বাংলা ব্যাকরণের বিষয়বস্তু সাজানো হয়েছে। আর আছে রামায়ন, মহাভারত সহ অন্যান্য গ্রন্থ থেকে বাংলার অজস্র উদাহরণ।

সবকিছু তিনটি স্তরে সাজানো। প্রথমে বাংলা বিষয়বস্তু, তারপর ইংরাজি হরফে বাংলার উচ্চারণ এবং সবশেষে সেটির ইংরাজি অনুবাদ যেমন : শুনুন বা সুনন .shoonon, to hear

A Grammar of the Bengal Languge' এই গ্রন্থ মুদ্রণে ইংরাজি হরফ যা দরকার হয়েছে, যে সব ইংল্যান্ড বা ভারতে ইতিপূর্বেই তৈরি হয়েছে কিন্তু বাংলা ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় হরফ এলো কোথা থেকে। বাংলা হরফ তো ইতিপূর্বে খোদাই হয়নি।

ইতিহাস চর্চার এই বিষয়টিই এখানে আজ মুখ্য আলোচনার বিষয়। ১৭৭৮ সালকে বাংলা মুদ্রণের পথচলা শুরুর কাল বলা হচ্ছে। শ্রীপান্থ, তাঁর 'যখন ছাপাখানা এলো' —গ্রন্থে মুদ্রণের 'আরশিতে বাঙালির প্রথম চলমান .(moveable) হরফ দেখা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্লক এখনকার 'রাবার স্ট্যাম্প'-এর মতো, একই কথা বারবার ছাপা হয় কিন্তু চলমান হরফ (moveable type) বলতে তাকে বুঝি, যা দিয়ে টানা ছাপার কাজ চলে। কয়েকটি ফাউন্ট (Fount : a set of type) খোদাই হলেই এমন কাজ হতে পারে।

এ বাংলা ফাউন্ট তৈরি করলো বা খোদাই করলো কে? ঐ ইংরেজদের মধ্যে কেউ কি? হালেদ সাহেব তো উইলকিন্সকে একাধারে ধাতুবিদ, খোদাইকার, প্রকাশক মুদ্রক— সবই উপাধিতে ভূষিত করছেন। আর কারো নাম তো তিনি ঐ গ্রন্থের দীর্ঘ মুখবন্ধে (Preface) উল্লেখ করেননি। কয়েকটি সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১। হালেদ ও উইলকিন্স দু'জনেই কুড়ি বছর বয়সে ভারতে আসেন, মূলত ফার্সী অনুবাদকের চাকরি নিয়ে। প্রথমজন ১৭৭২ এবং দ্বিতীয় জন ১৭৭০ সালে।

২। তাঁরা দ্রুতই ফার্সী ও বাংলা ভাষা চর্চা আরম্ভ করেন। এ কাজে তাঁদের সহায়তা দেন দেশীয় পণ্ডিত ও মুন্সিগণ।

৩। ১৭৭৬ সালে হালেদ সাহেবের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডন থেকে। যেটির নামপত্রে এমন বিবরণ আছে।

A CODE OF GENTOO LAWS
OR
ORDIN ATIONS OF THE PUNDITS
FROM A PERSIAN TRANSLATION
MADE FROM THE
ORIGINAL
WRITTEN THE SHANSCRIT LANGUAGE
London, published in the year MDCCLXVI

এগারোজন পণ্ডিতকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মাত্র এক টাকা দৈনিক বেতন দিয়ে (!)। 'Hastings preface to Wilkin's translation of the Bhagabat Geeta informs us that the Pundits were paid an honorarium of a rupee a day for two years'. Introduction of Nikhil Sarkar (1978) of reprint of 'A Grammar of the Begal Language'

প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছে বাংলার হরফ (ধাতুর উপরে) কেটেছিলেন কি চার্লস উইলকিন্স স্বয়ং। এত কম সময়ে একজন ধাতুবিদ, খোদাইকার ও ঢালাইকার হওয়া সম্ভব বিদেশীর পক্ষে, যিনি দেশীয় ভাষা ভাল করে শেখা, পড়া বা লেখার কাজটা তখন চালিয়ে যাচ্ছেন দেশীয় পণ্ডিত ও মুন্সিদের সহায়তা।

একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যতে পারে :

এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে শ্রী নিখিল সরকারের ভূমিকার কথা। ১৫ পাতায় তিনি লিখেছেন : "In his preface to The Grammar, Halheed decribed Wilkins as 'the Engraver, the Founder and the Printer.' The Serampore Missionaries thought that he was ably assisted by a local artician, Panchanan Karmakar whose talent proved to be an asset to the Mission press Later." সত্যিই শ্রীরামপুর মিশনের কার্যবিবরণীতে আমরা প্রথম জানতে পারলাম পঞ্চানন কর্মকারের কথা।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৯৬ সালে কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে সরাসরি জানালেন, 'ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির উইলকিন্স সাহেব ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিতে একটি বাঙলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, পঞ্চানন কর্মকার এই মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর খোদাই করিয়াছিলেন।' (ঐ গ্রন্থ, ২য় খণ্ড ৬৮৬ পাতা)' ....পঞ্চানন কর্মকার বয়সে প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতৃস্পুত্র মনোহর কর্মকার (আসলে মনোহর ভ্রাতুস্পুত্র নয় তিনি পঞ্চাননের শিষ্য এবং পরবর্তীকালে জামাতা হন, কন্যা লক্ষ্মীকে বিবাহ করেন। তিনিও ত্রিবেণী নিবাসী— লেখক) অক্ষর ঢালাই কার্যে অতঃপর তৎস্থলে সম্পূর্ণরূপে অভিষিক্ত হইলেন।' (ঐ গ্রন্থ, পাতা ৬৮৭)।

গ্রাহম্ শ, ১৯৮১ সাল লন্ডন থেকে প্রকাশিত PRINTING IN CALCUTTA TO 1800' গ্রন্থে ৬৯ পাতায় 'চার্লস উইলকিন্স' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার মূলতঃ তিনটি অংশ ঃ

প্রথমাংশে তিনি চার্লস উইলকিন্সের জীবন ও সার্বিক কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। ১৭৭৮ সালে হুগলিতে .'A Compendious Vocabulary English and Persian' এবং ১৭০১ থেকে ১৭৮৩-র মধ্যে কলকাতায় আরো ন'টি বই প্রকাশ করেন।

ইতিমধ্যে তাঁর নেতৃত্বে 'অনারেবল কোম্পানীজ প্রেস গঠিত হয়। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' গঠনে তিনি ছিলেন পথিকৃত।

এই অংশেই তিনি হালেদের (Preface' তুলে ধরেন 'In the Preface to Halhed's Work' (P.XXIV) Wilkins is praised for having been metalluragist, engraver, founder and printer, Combining "merit of invention" with "Personal Labour", acting throughout in "Solidary experiment." (পাতা-৭০)

অবশেষে গ্রাহাম শ জানাচ্ছেন, '...The preperation of these famous Bangali and Persian founts as a tripartile excercise."

'Wilkins...proves linguistice and administrative abilities but with no known skills in the processes of cutting and casting types, engages...Joseph Shepherd to assist him ...and of a Bangali blacksmith Panchanan Karmakar to help him with the actual custing of the founts, with which he himself actually printed the worked...'

এখন আর এ সন্দেহ থাকে না বাংলা ভাষা মুদ্রণ বিপ্লবের নেপথ্য কারিগর কে ছিলেন। অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়ের বেদনাহত অনুভব, উপেক্ষার অন্ধকার থেকে পঞ্চানন কর্মকারকে তুলে আনার আকুতি, ইতিহাস চর্চার উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'A Grammer of the Bengal Language' বাংলা ভাষায় প্রথম চলমান হরফে ছাপা গ্রন্থ, দীর্ঘ দুশো বছর ধরে অনেক টানাপোড়েনসহ এক জায়গায় সিদ্ধান্তে আনতে পারে।

পক্ষান্তরে, ১৭৭৮ সালে হ্যালেড সাহেবের একটা বাংলা ব্যাকরণ 'A Grammar of the Bengal Language', গ্রন্থ বাংলা ভাষার মুদ্রণ শিল্পের সূচনার ইতিহাস, পঞ্চানন, কর্মকারের ধাতব হরফ, চার্লস উইলকিন্সকে বাংলা টাইপ তৈরি করে সহযোগিতা দেন। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে কলকালতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগদান এবং চার্লস উইলকিন্সের কাছ থেকে নাগরি ও ফার্সী অক্ষর দেখে, খোদাই টাইপ বানিয়ে ফেলেন পঞ্চানন কর্মকার।

প্রসঙ্গত, ছাপাখানার ইতিহাসে মালদহ জেলার মদনাবতী নীল কুঠির উইলিয়াম কেরী একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব।

১৭৯৯ সালে উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় জগৎ বিখ্যাত শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস। পঞ্চাননের কীর্তি-কৃতিত্বে আকৃষ্ট হয়ে কেরী সাহেব তাকে ডেকে আনেন। এবং ১৮০১ সালে তাঁর নিউটেস্টামেন্ট -এর বাঙলা অনুবাদ গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপর পঞ্চাননের প্রস্তুত নাগরি হরফে কেরী সাহেবের সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ ছাপা হয়। বাংলা বিদ্বজনেরা দেখলেন শ্রীরামপুরের প্রেসে বাঙলা বই ছাপানোর কাজ আরম্ভ হয়েছে। শ্রীরামপুরের নির্মিত টাইপ এশিয়ার বিভিন্ন অংশে চালান করা হত। এ প্রসঙ্গে, এ কথা অবশ্য স্মরণীয় ঘটনা এই যে— মালদহের নীলকুঠিকে আশ্রয় করে

গৌড়বঙ্গের মালদহের বাঙলা গদ্যচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। বাঙলা গদ্যচর্চার আদিপর্ব মালদহের নীলচাষ এবং জর্জ উডনি, উইলিয়াম কেরী, জনটমাস, মার্শম্যান প্রভৃতি নীলকর সাহেবদের কাছে ইতিহাস হয়ে আছে। ইংরেজিতে বেঙ্গলি গেজেট ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর রামমোহন রায় শুরু করেন ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের গ্রন্থাবলী প্রকাশনে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকে। প্রথম বাঙলা পত্রিকাও এখান থেকেই প্রকাশিত হয়। তাই পঞ্চানন কর্মকারকে বলা হয় নবজাগরণের অন্যতম বাহক। সেই ভাষা সলিলের ভগীরথ হরফ শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার।

তথ্যসূত্র :

১. দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন / চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। (পুস্তক)

২. বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক/ ড: সবিতা চট্টোপাধ্যায়। (পুস্তক)

৩. মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং পারিষদবর্গ/ রাধারমণ রায়। (প্রবন্ধ)

৪. পুঁথি থেকে পুস্তক হরফে বরফ গলিয়েছিলেন অক্ষর শিল্পী পঞ্চানন কর্মকার/ অসিত দত্ত। (প্রবন্ধ)

৫. মালদহের নীলকুঠি ও নীলচাষ / ড: রাধাগোবিন্দ ঘোষ, বঙ্গরত্ন। (প্রবন্ধ)

৬. মালদহের নীলচাষ ও নীলচাষী / ড: ফণী পাল। (প্রবন্ধ)

ব্যক্তিঋণ : বিনয়কুমার দাস চৌধুরী

জগন্নাথ কি বৃক্ষদেবতা—এই প্রশ্নটি একান্তই আমার ব্যক্তিগত ভাবনা। কাহারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা আমার অভিপ্রেত নয়। ভূতত্ত্ববিজ্ঞানী পেশায় এটা আমার কৌতুহল। বেদ উপনিষদ ইত্যাদি পুস্তকে উল্লিখিত দেবতাগণের মধ্যে জগন্নাথদেবের উল্লেখ নাই। উড়িষ্যা ও সন্নিহিত বঙ্গভূমির আদিবাসীদের লোকগাথায় জগন্নাথ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পর বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে অজাতশত্রু রাজা হলে বৌদ্ধধর্ম নিষিদ্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাজানুকুল্য লাভ করে। ঐতিহাসিকগণের একাংশের ধারণা পুরী বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের উপর নির্যাতন শুরু হইলে পুরীর বৌদ্ধ উপাসনা কেন্দ্র জগন্নাথ মন্দিরে পরিবর্তিত হয়।

আনুমানিক ১১৫০ খৃষ্টাব্দে রথযাত্রার মাধ্যমে জগন্নাথদেবেরা মূর্তি মন্দিরে প্রবেশ করে। ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে পর্যটক ODORIC এর পুস্তকে রথযাত্রার বর্ণনা আছে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে জানা যায় জনৈক রাজা রাজধানীর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করিতে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করেন। ঐ ব্রাহ্মণ সুমদ্রতীরবর্তী একটি স্থানে একটি পক্ষীকে বারংবার সমুদ্রে চান করতে দেখেন। ঐ স্থানের মহত্ব উপলব্ধি করে রাজাকে জানালে ঐ স্থানে নগর গঠিত এবং মন্দির নির্মিত হয়। ঐ সময় রাজা একদিন স্বপ্নের নির্দেশ পান নির্দিষ্ট একটি দিনে সমুদ্রে একটি ভাসমান কাষ্টখণ্ড পাওয়া যাবে। ঐ কাষ্টখণ্ড সংগ্রহ করে একটি গোপনকক্ষে রাখবার পর ঐ কাষ্টখণ্ড যে মূর্তি ধারণ করবে তাহা মন্দিরে স্থাপন করিতে। এভাবেই জগন্নাথদেবের উপাসনা শুরু। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভক্তবৃন্দ জগন্নাথ দর্শন ও রথযাত্রার রজ্জু টানিবার জন্যই প্রতিবছর পুরীধামে সমবেত হন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধূমধাম
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম,
রথভাবে আমি দেব পথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।

বৈদিক সভ্যতায় (১৫০০-৬০০ খৃষ্টপূর্ব) মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না, মন্ত্র এবং উপাসনায় আবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে প্রাগার্য জনপদসমূহে বসবাস করবার জন্য সামাজিক প্রথায় প্রাগার্য ভাব ধারণা ও ধর্মবিশ্বাসের সংমিশ্রণ ঘটে এবং মূর্তিপূজার শুরু।

প্রাগার্য সভ্যতা ভারতের নিজস্ব, প্রস্তরযুগে (৪,০০,০০০ হইতে ২,০০,০০০ খৃষ্ট পূর্ব) ব্যবহৃত দ্রব্য রাজস্থান, গুজরাট, দক্ষিণ ভারতে পাওয়া গেছে। লৌহযুগ ও তাম্রযুগে (৭০০০ খৃষ্টপূর্ব কৃষিভিত্তিক সভ্যতার শুরু এবং শস্যদায়িনী ধরণীকে মাতৃরূপে বন্দনা করেছে প্রাগার্য ভারতবাসী।

সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত শীলমোহরে শস্যউৎপানকারী নারীমূর্তি রয়েছে। সম্ভবত

সেকালের কৃষি উৎসবই একালের দুর্গোৎসব। সপ্তমী বিহিত পূজারম্ভের প্রাক্কালে গণেশের পাশে অধিষ্ঠিতা কলাবৌ (নবপত্রিকা) গাছ বা গাছের ছাল দিয়ে তৈরি। দুর্গাদেবী যে শস্যদেবী নবপত্রিকা স্থাপনই তাহার প্রমাণ।

বেদ উপনিষদ-এ উল্লিখিত না হলেও জগন্নাথ দেব হলেন কেন। দেবতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে দিব্ (দীপনে) ধাতু হইতে দেব অর্থাৎ যাহা উজ্জ্বল অগ্নি সূর্য চন্দ্র। কিন্তু পর্জ্জন্য (ইন্দ্র) যিনি বৃষ্টি করেন তিনি উজ্জ্বল নহেন তবে দেব হইলেন কেন। আমার মতে বেদ রচিত হইবার সময় ব্যাকরণ নির্ধারিত হয়নি তাই সাধারণ বিবেচনাই যুক্তিসংগত। ভারতীয়গণ যিনি দান করেন তাহাকে দেওতা বলিত, আদিবাসীগণের এই দেওয়া শব্দটি শুদ্ধ ভাষায় দেবতা হয়েছে যেমন অগ্নি তাপ দেন সূর্য আলোকরশ্মি দেন পর্জ্জন্য বৃষ্টি দেন। এইরূপ প্রাগার্য ধর্মবিশ্বাসে যাহা মানবজীবনকে শক্তিদান করে তাহাই দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছে। সর্প জীবন নাশ করে তাই সর্পকে তুষ্ট করার জন্য বাঙালীদের মনসাপূজা আদিবাসীগণের ধর্মানুষ্ঠানের পরিচয়। জগন্নাথ শব্দটির অর্থ জগতের নাথ অর্থাৎ জগতের প্রভু। জগৎ প্রাণের আধার, উদ্ভিদ ধরণীতে প্রাণ সঞ্জীবিত করেছে। ৪০০ কোটি বর্ষপূর্ব সময়ে পৃথিবীর বহিরাবরণ অর্থাৎ গ্যাসীয় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে ভূপৃষ্ঠে জলকণার উৎপত্তি এবং স্থলভূমি ও সমুদ্র গঠিত হয়। বজ্রপাতের শক্তিতে সূচনা আদি প্রাণ সমুদ্রজলে ভাসমান সেই নীলাভ সবুজ শৈবাল সমুদ্রতীরে তৃণভূমি এবং বিমুক্ত অক্সিজেন উৎপন্ন হবার ফলে উদ্ভিদ এবং এককোষী প্রাণ হতে জলচর উভচর স্থলচর নভশ্চর প্রভৃতি প্রাণীর যুগে যুগে সৃষ্টি স্থিতি লয়। উদ্ভিদজগৎ প্রাণীজগৎকে পুষ্টি দান করে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষবন্দনা কবিতা হতে কিছু উদ্ধৃতি:

'সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে সেই হোম তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধ রূপ
তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব তারি দূত হয়ে
ওগো মানবের বন্ধু আজি এই কাব্য— অর্ঘ্য লয়ে।
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী,'

এইজন্য আমি মনে করি কাষ্ঠখণ্ডে নির্মিত জগন্নাথ প্রাগার্য ভারতীয়গণের বৃক্ষদেবতা। এ প্রসঙ্গে হিন্দুগণের কল্পতরু এবং খৃষ্টানদের Xmas Tree উল্লেখযোগ্য।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ

(অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ও কৃশানুর ভূতপূর্ব সম্পাদক)

রচিত কয়েকটি মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ

১। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা

২। পূর্ববঙ্গের কবিগান

৩। পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা

৪। প্রসঙ্গ ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

Krishanu Quarterly
Vol XXXXXII/I
Rs. 75.00
Regd No. R. N. 16533/68

বিশ্বশান্তি কামনায়

ষড়ভূজ মহাপ্রভু মন্দির

শ্রীরামনগর, ভুবনেশ্বর ৭৫১০০২

মদন দাস কর্তৃক ৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত ও
লোনস্টার সল্যুশনস, ৬২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।